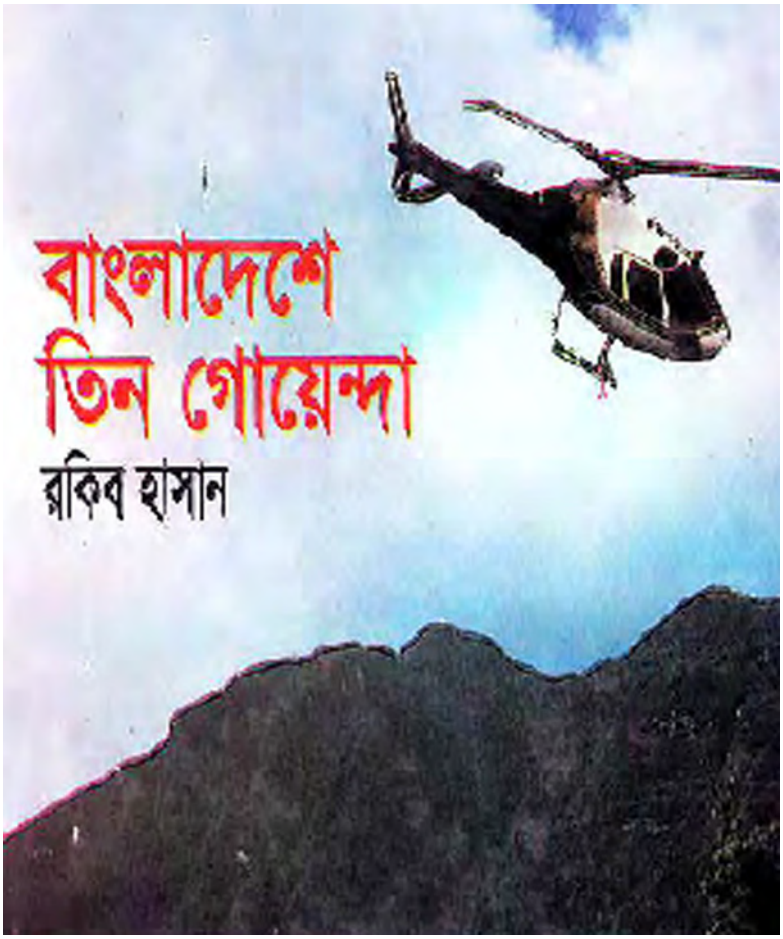
বাংলাদেশে
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান

পরিচয়

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান–ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো। অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড–বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

নতুন আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে চলেছি।
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

এক

রাত দশটা।

ঢাকার উত্তরাব অভিজাত এলাকা। কিশোরের মামা অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি আরিফুর রহমান চৌধুরীর বাড়ি। বসার ঘরে বসে জরুরী আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা কিশোর, মুসা ও রবিন।

বাইরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। এই অক্টোবরের শেষেও পুরোদমে ফ্যান চালাতে হয়। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম থাকে, সন্ধ্যার পর প্রায়ই নামে বৃষ্টি। ঢাকার এই আবহাওয়া দেখলে মনে হয় না কোনকালেও শীত পড়বে এখানে।

দশটা বাজল। ঘরে ঢুকল মোমেন মিয়া। বাড়ির দারোয়ান-কাম-কেয়ারটেকার সে। 'কিশোরভাই, একটা ছেলে দেখা করতে আসছে আপনের সঙ্গে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর, 'এত রাতে? কে?'

'নাম কইল না। কইল, আপনের কাছেই খুইল্লা কইব সব। জরুরী কথা আছে নাকি।'

অবাক লাগল তিন গোয়েন্দার। কিশোর বলল, 'আচ্ছা যাও, নিয়ে এসোগে।'

মিনিটখানেক পরেই ঘরে ঢুকল ওদের চেয়ে দু'এক বছরের বড় এক কিশোর। লম্বা। সুদর্শন। এলোমেলো চুল। চুলে, মুখে পানির কণা লেগে আছে। রিকশা থেকে নামার সময় ভিজেছে।

হাতটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, 'আমি অশোক। অশোক চ্যাটার্জি।'

'আমি কিশোর পাশা,' অশোকের হাত ধরে ঝাঁকি দিল সে।

'জানি,' হাসল ছেলেটা। 'তুমি কিশোর পাশা। ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড। তুমি করেই বলে ফেললাম।'

'তা-ই তো বলবে,' হেসে জবাব দিল মুসা। 'আমরা তো আর তোমার গুরুজন নই। বয়েসেও বড় না।'

রবিনের সঙ্গেও হাত মেলাল অশোক। তারপর সোফায় বসল। 'নিশ্চয় অবাক হচ্ছো, তোমাদের কথা আমি জানলাম কিভাবে? বাংলাদেশের প্রায় সব কিশোরই—অন্তত যারা পত্রিকা পড়ে, তোমাদের

কথা জেনে গেছে এতক্ষণে। পত্রিকায় তোমাদের সাক্ষাৎকারটা কিন্তু সাংঘাতিক হয়েছে, যা-ই বলো।'

এবার অনেক বড় পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অনেকেই, তাদের মধ্যে সেই দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বেদুইন বৈমানিক ওমর শরীফও আছে, যাকে সঙ্গে নিয়ে ওকিমুরো কর্পোরেশন গঠন করেছে ওরা। ওদের উদ্দেশ্য, দেশে দেশে ছড়িয়ে দেবে ওকিমুরো কর্পোরেশনের শাখা অফিস। কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা এক কথায় সহযোগিতা করতে রাজি হয়ে গেছেন। মেরিচাচীর তেমন মত নেই। তবে আপত্তিও করেননি। মুসা আর রবিনের বাবা-মাকেও রাজি করাতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

লন্ডনের অফিসটা খুলতে গেছে ওমর নিজে। আর তিন গোয়েন্দা চলে এসেছে ঢাকায়। বাংলাদেশের অফিসটা খুলতে। বাংলাদেশে শুধু ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিসই খুলবে না তিন গোয়েন্দা, একটা টিভি চ্যানেল খুলতেও আগ্রহী। নামও ঠিক হয়ে গেছেঃ প্রিয় টেলিভিশন, সংক্ষেপে 'প্রিয়টিভি'।

তিন গোয়েন্দার ইচ্ছে, চ্যানেলটা ছোটদের জন্যে খোলা হবে। ছোটরা এতে বেশি বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে। প্রথম দিকে সবই ছোটদের অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। জনপ্রিয় হলে পরে বড়দের কথাও ভাববে।

আরিফ সাহেব ওদের এ পরিকল্পনায় মহাখুশি। উৎসাহিত তো করছেনই, বলে দিয়েছেন তাঁর সাধ্যমত সহযোগিতা তিনি করে যাবেন। আপাতত ওকিমুরো কর্পোরেশনের ঢাকা অফিসটা তাঁর বাড়িতেই খোলা হয়েছে। 'প্রিয়টিভি'র জন্যে বাড়ি খোঁজা হচ্ছে।

'ইস্, মনে মনে কত যে খুঁজেছি তোমাদের,' অশোক বলল। 'আমেরিকার ঠিকানা জানলে কবেই চিঠি দিতাম।'

'তা কারণটা কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আমাদের এত খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?'

'গোয়েন্দাদের যে কারণে খুঁজে বেড়ায় মানুষ। একটা সাংঘাতিক বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে এসেছি।' কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরল অশোক, 'আমাকে বাঁচাও, ভাই!'

কিশোর বলল, 'সমস্যাটা কি, সেটা তো আগে বলবে। তারপরে না বাঁচানোর প্রশ্ন।'

'আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল,' অশোক বলল।

একটা মুহূর্ত চুপ করে অশোকের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চা দিতে বলব?'

মাথা নাড়ল অশোক। 'না।'

'অন্য কিছু দিতে বলব?'

'উঁহু। যে কারণে এসেছি, সেটা বরং বলি। অনেক লম্বা কাহিনী। তোমাদের সময় আছে তো?'

লম্বা কাহিনী শুনে আগ্রহ বেড়ে গেল তিন গোয়েন্দার। কিশোর বলল, 'আছে।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল অশোক। তারপর বলতে লাগল, 'আমার সমস্ত সর্বনাশের মূল আমার এক অদ্ভুত শখ। তালাচাবি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি।'

'তালাচাবি আবার শখ হয় নাকি কারও?' না বলে পারল না মুসা।

'হয় না, কিন্তু আমার হয়েছিল,' অশোক বলল। 'খেসারতও দিতে হয়েছে সেজন্যে। হোস্টেলে থাকতাম। একদিন রুমের চাবি ভেতরে রেখে দরজা লাগিয়ে দিয়েছিলাম। খোলার জন্যে চাবিওলাকে ডেকে আনি। ওই সময়ই আমার মাথায় ঢোকে, আবার যদি কোনদিন তালা আটকে যায় তাহলে নিজের তালা নিজেই খুলব। শুরু হলো প্র্যাকটিস। নিজের ট্যালেন্ট দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই। উৎসাহ বাড়ে। নানা রকম তালা কিনে এনে সেগুলো চাবি ছাড়া খুলতে থাকি। তালা খোলার বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি। তালার জাদুকর বনে যাই। কথাটা ছড়িয়ে পড়ে সারা স্কুলে। এ কান ও কান হতে হতে কথাটা এক ভয়ানক ডাকাতের কানেও চলে যায়। আমাকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা করে সে।

'যেদিনকার ঘটনা, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। বাড়ি ফেরার জন্যে ট্যাক্সি ডাকতে যাব, এই সময় সামনে এসে দাঁড়ায় একটা গাড়ি। যেচে পড়ে প্রায় জোর করেই লিফট দেয় লোকটা আমাকে। খানিকদূর যাওয়ার পর দেখি সামনে গাড়ির লাইন লেগেছে। রাস্তা আটকে গাড়ি চেক করছে পুলিশ। ড্রাইভার আমাকে বসতে বলে কি হচ্ছে দেখে আসার ছুতোয় গাড়ি থেকে নেমে যায়।

'সামনের গাড়িগুলোকে চেক করে করে ছেড়ে দিতে থাকে পুলিশ। এগোতে থাকে গাড়ির লাইন। পেছনের গাড়িগুলো ক্রমাগত হর্ন দিতে থাকে। আমি ভাবলাম, ড্রাইভার নিশ্চয় ল্যাট্রিন-ট্যাট্রিনে গেছে। সেজন্যে দেরি হচ্ছে। ড্রাইভ করতে জানি। তবে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে এগোই। ভেবেছিলাম, পুলিশ ব্যারিকেড পার হয়ে রাস্তার পাশে ড্রাইভারের অপেক্ষা করব। কিন্তু তা আর ঘটেনি। গাড়ির নম্বর দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ। থানায় নিয়ে যায়। জানতাম না, গাড়িটা ছিল চোরাই গাড়ি।

ওটাকে ধরার জন্যেই রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিল পুলিশ। চোরাই মালসহ ধরা পড়ি। গাড়ির স্টিয়ারিঙে আমার হাতের ছাপ। যে লোকটা আসল চোর সে আর ফেরেনি। তবে তার ছাপও পাওয়া গেছে স্টিয়ারিঙে। আমার কথা বিশ্বাস করল পুলিশ। আমাকে ছেড়ে দিল।

'কিন্তু একবার কাউকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে সে দোষী না হলেও তার সামাজিক অবস্থান যে কোথায় নেমে যায় সেটার প্রমাণ পেতে থাকলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার কোন কথা শুনল না। আমাকে স্কুল থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। আমার না করা অপরাধের দায় আমার বাবাকেও বহন করতে হলো। চাকরীস্থলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকল সহকর্মীরা, যেন দোষটা তারই।

'বাড়িতে দরজা দিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে রইলাম ঘরের মধ্যে। আমার এ ভাবে পড়ে থাকা সহ্য করতে পারল না মা। একদিন অনেক বকাঝকা করে বাইরে পাঠাল। বলল, খানিক ঘুরে আয়। বেরোলাম। আসল শয়তানটার সঙ্গে সেদিনই প্রথম দেখা হলো আমার।

'আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছিল তার চর। সেই ড্রাইভারটা। বাড়ি থেকে বেরোতে আমার পিছু নিল সে। রাস্তায় নির্জন একটা জায়গায় দেখা করল। তাকে দেখে প্রচণ্ড রেগে উঠলাম। কিন্তু লোকটা রাগল না। প্রায় জোর করেই আমাকে নিয়ে গেল মস্ত এক অফিসে। দেখা হলো ওর বস্ কারুণ শিকদারের সঙ্গে। অকপটে স্বীকার করল কারুণ, ইচ্ছে করেই গাড়ি চুরির প্ল্যান করে আমাকে ফাঁসিয়েছে সে। কারণ, আমাকে নাকি তার প্রয়োজন আছে। নকুল শ্যাম আর কারুণ শিকদার মিলে আমাকে পটানো শুরু করল...'

'নকুল শ্যামটা কে?' বাধা দিল কিশোর। 'ওই ড্রাইভারটা নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অশোক। 'দু'জনে মিলে নানাভাবে পটাতে লাগল আমাকে। বোঝাল, কোথাও আমি কোন ভাল চাকরি পাব না। পুলিশে ধরেছিল শুনলে কেউ আমাকে কাজ দেবে না। তবে কারুণ আমাকে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। জোর করে কিছু টাকা আমার হাতে গুঁজে দিল সে। বলল এটা রাখো। তোমার চাকরী পাক্কা। আমার যখন প্রয়োজন হবে, তোমাকে খবর দেব। জিজ্ঞেস করলাম, চাকরীটা কি? বলল, পরে জানাব। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে রাখলাম টাকাগুলো। ছুঁতেও ঘৃণা হচ্ছিল।'

'তোমাকে খবর দিয়েছিল কারুণ?' রবিনের প্রশ্ন।

'দিয়েছিল।'

'নিশ্চয় ডাকাতি করার জন্যে,' কিশোর বলল।

অশোক অবাক। 'তুমি জানলে কি করে?'

'তালা খোলার ওস্তাদ তুমি, তোমাকে প্ল্যান করে ফাঁসানো, আগে

থেকে মোটা টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে রাখা—সব মিলিয়ে সেদিকেই কি টার্গেট করে না?'

মাথা দোলাল অশোক, 'হ্যাঁ, হয়তো তা-ই করে। কিন্তু আমি গাধা তখন কিছু বুঝতে পারিনি। যাই হোক, দিন কয়েক পরে কারূণের ডাক এল। আমাকে দিয়ে ঢাকার একটা অনেক বড় গহনার দোকান থেকে প্রায় বিশ কোটি টাকার হীরা-জহরত আর গহনা ডাকাতি করাল। যে সেফে ওগুলো রাখা ছিল, ওটাতে ইলেকট্রনিক তালা লাগানো। মালিক কোনদিন কল্পনাই করেনি, ওই তালা খুলে ফেলতে পারবে কেউ।

'ডাকাতি করতে হবে শুনে কোনমতেই রাজি হতে চাইনি। কারূণ আমাকে পিস্তল দেখাল। আমি বললাম, পিস্তলের ভয় আমি করি না। মেরে ফেললে ফেলুক, তা-ও ডাকাতি আমি করতে পারব না। কারূণ আমাকে ভয় দেখাল, ওর কথা না শুনলে আমার বাবাকে গুলি করে মারবে সে। বলল, আমার বোনকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। আমি রাজি না হলে ওকে নারী পাচারকারীদের কাছে বেচে দেবে। আমার বোনকে যে ধরে নিয়ে গেছে সেটা প্রমাণের জন্যে বাড়িতে ফোন করাল আমাকে দিয়ে। মা ফোন ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানাল, জয়িতা বাড়ি ফেরেনি। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। অন্ধকার রাস্তায় বাবার গুলিবিদ্ধ লাশটা পড়ে আছে কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। রাজি হয়ে গেলাম ওর কথায়।'

'পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত ছিল তোমার,' রবিন বলল।

'ভুলটা তো ওখানেই করেছি। তা ছাড়া মনে করেছিলাম, গাড়ি চুরির মিথ্যে অপরাধে হলেও তো একবার থানায় গেছি, আমার কথা বিশ্বাস করবে না পুলিশ।'

'সব কথা খুলে বললে নিশ্চয় বিশ্বাস করত। কারূণের অফিসটা দেখিয়ে দিতে পারতে তুমি। নকুল শ্যামকে চেনাতে পারতে।'

'পারতাম। কিন্তু প্রমাণ করতাম কিভাবে কৌশলে ওরাই আমাকে ফাঁসিয়েছে?'

'প্রমাণ পুলিশই জোগাড় করে ফেলত।'

'তখন আসলে অত কথা ভাবিইনি।'

'এখন আর ওসব বলে লাভও নেই,' কিশোর বলল। 'যা ঘটানোর তো ঘটিয়েই ফেলেছে।' অশোকের দিকে তাকাল সে, 'হ্যাঁ, তারপর? ডাকাতিটা করলে। মালগুলোর কি হলো?'

'সেটা বলতেই তো এলাম,' অশোক বলল। 'পানি খাওয়াও।'

দুই

লাফ দিয়ে উঠে ফ্রিজ থেকে পানি আনতে ছুটল মুসা। ফিরে এল পানি, কোকের বোতল আর গ্লাস নিয়ে। অশোকের সামনে রাখল।

প্রথমে পানি খেল অশোক। তারপর কোক ঢালল গ্লাসে। চুমুক দিতে দিতে আবার আগের কথায় ফিরে গেল, 'ডাকাতির মাল নিয়ে কিভাবে পালাব আমরা, আগেই ঠিক করে রেখেছিল কারুণ। ঢাকা থেকে গাড়িতে করে চলে যাব চিটাগাং। পতেঙ্গা বন্দর থেকে দূর সাগরে যাওয়ার উপযোগী বড় ট্রলারে করে সাগর পাড়ি দিয়ে মিয়ানমারে ঢুকব। ওখানকার চোরাই মার্কেটে জিনিসগুলো বিক্রি করে দিতে নাকি অসুবিধে হবে না কারুণের।

'নকুল আর আমি ছাড়াও কারুণের দলে চতুর্থ আরও একজন লোক ছিল, আমির সওদাগর নামে এক আধবুড়ো সারেং। চোরাচালান সহ ছোটখাট নানা অপরাধে কয়েকবার জেল খেটেছে। আগেই তাকে টাকা দিয়ে চিটাগাং পাঠিয়ে দিয়েছিল কারুণ, সেকেন্ডহ্যান্ড একটা ট্রলার কিনে রেডি হয়ে থাকার জন্যে। কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, সে ছাড়া ট্রলারে দ্বিতীয় যেন আর কোন লোক না থাকে।

'পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বহু কষ্টে চিটাগাং পৌঁছুলাম। ট্রলারেও উঠলাম। ছেড়ে দিল ট্রলার। মাঝ সাগরে পৌঁছানোর পর শুরু হলো বিপত্তি। বাদ সাধল সাগর। ঝড়ে পড়লাম আমরা। পথ হারিয়ে চলে গেলাম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

'দ্বীপ থেকে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক দূরে থাকতে এক রাতে নকুলকে হাল ধরতে বলল কারুণ। গভীর রাতে ধাক্কা দিয়ে ট্রলার থেকে আমির সওদাগরকে উত্তাল সাগরে ফেলে দিল সে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে খুন করল?'

'হ্যাঁ,' কোকের গ্লাসে চুমুক দিল আবার অশোক। 'ব্যাপারটা নকুল আর আমি দু'জনেই দেখে ফেললাম। নকুল বলল, চেপে যাও। কিন্তু চুপ থাকতে পারলাম না। লোকটাকে কেন খুন করল, কারুণকে জিজ্ঞেস করলাম। হেসে বলল কারুণ, ভালই তো করলাম। যত বেশি লোক থাকবে, ভাগের মাল তত কমবে। যত খাটাখাটনি আমরা করলাম, পুলিশের তাড়া আমরা খেলাম, শুধু শুধু বুড়োটাকে ভাগ

দিতে যাব কোন্ দুঃখে? এত পাষণ্ড লোক জীবনে দেখিনি। বললাম, তাই বলে মেরে ফেললেন! তা ছাড়া সারেং নেই, আমরা এখন মিয়ানমারে যাব কি করে? আবারও হাসল কারুণ। বলল, এতদিন ট্রলারে থেকে কি ঘোড়ার ঘাস কেটেছি? ট্রলার চালানো শিখে ফেলেছি আমি। নকুলও মোটামুটি মন্দ পারে না।

'কিন্তু কথাটা যে ঠিক বলেনি কারুণ, সেটা বোঝা গেল কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই। নির্জন একটা দ্বীপের কিনারে ডুবো চরায় ধাক্কা লাগিয়ে বসল নকুল। ট্রলারের তলা গেল ভেঙে। অল্প পানিতে কাত হয়ে ভেসে রইল ওটা।

'নকুলকে অনেক গালাগাল করল কারুণ। হাত উঁচিয়ে বার বার মারতে গেল। কিন্তু তাতে তো আর সমস্যার সমাধান হবে না। দ্বীপে নামতে বাধ্য হলাম আমরা। কারুণ সঙ্গে করে নিয়ে গেল ডাকাতি করা হীরা-জহরতের ব্যাগটা।

'দ্বীপে একটা ঘর চোখে পড়ল। ছোট্ট কেবিন। তীরের কাছেই। বন্ধ দরজায় থাবা দিলাম। কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। কেউ নেই। তবে মানুষের বাস করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব জিনিস আছে। ঘরে একটা ছোট চৌকি। তাতে বিছানা পাতা। তাক ভর্তি খাবার-দাবার। একটা তাকে কয়েক টিন বীয়ারও রাখা।'

'তারমানে স্বপ্ন দেখছিলে তোমরা, তাই না?' মুসা বলল।

'না, স্বপ্ন না বাস্তব। এমনকি একটা কেরোসিনের চুলাও ছিল ঘরে। ঝড়ে পড়ার পর ট্রলারে আর রান্না করার সুযোগ হয়নি। তাই কেবিনের মধ্যে খাওয়াটা খুব জমল আমাদের সেদিন। তারপর বেরোলাম জায়গাটা ঘুরে দেখতে। ছোট্ট দ্বীপ। মাইল তিনেক লম্বা, সিকি মাইল চওড়া। পাথরে ভর্তি। যেখানে সেখানে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। দ্বীপটার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তীরের প্রায় চতুর্দিকেই উঁচু পাড়, কোথাও কোথাও পাহাড়ের মত উঁচু, কিন্তু মাঝখানটা নিচু। উত্তর আন্দামানের মূল ভূখণ্ড ওখান থেকে বেশি দূরে না। দেখা যায়। কিন্তু যেতে হলে নৌকা লাগবে। দূরে বেশ কিছু নৌকা, ট্রলার ছড়ানো-ছিটানোভাবে চোখে পড়ল। সাগরে মাছ ধরছে। আগুন জ্বেলে সঙ্কেত দেয়ার কথা বললাম। কারুণ বলল, পরে।

'দ্বীপে পাখি ছাড়া আর একটা মাত্র প্রাণী প্রচুর পরিমাণে দেখলাম। শিয়াল। সাগরের মাঝখানে ওখানে ওই দ্বীপের মধ্যে শিয়াল এল কোথা থেকে সেটাও এক অবাক করার মত বিষয়। রূপকথার মত লাগছে না?'

'না, লাগছে না,' কিশোর বলল। 'বলে যাও।'

'রাত হলো। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। কারণ আমাদের বস্। সুতরাং ঘরের একমাত্র বিছানাটায় শুলো সে। নকুল আর আমি মেঝেতে। পরদিন সকালে আরেকটা খুনের দিকে মোড় নিল পরিস্থিতি। নাস্তার পর বাইরে বেরোলাম। আমার সাথে বেরোল নকুল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, বুঝতে পারছ কিছু? কিছু লক্ষ করেছ? ব্যাগটা লুকিয়ে ফেলেছে কারণ। সমস্ত মাল সে একাই মেরে দেয়ার মতলব করেছে। আমাদেরও ভাগ দেয়ার ইচ্ছে নেই তার। ও একটা কেউটে সাপ। সুযোগ পেলেই খুন করবে আমাদেরকে ও, দেখো, আমির সওদাগরের মত।

'নকুলের কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি নিজেও এই কথাটাই ভাবছিলাম। কি করা যায় জিজ্ঞেস করলাম নকুলকে। নকুল বলল, নিজেকে যতটা চালাক বলে জাহির করে ও, ততটা আসলে নয়। ব্যাগটা কোথায় লুকিয়েছে জানি আমি। মাটিতে গর্ত করে যখন রাখছিল ওটা, লুকিয়ে থেকে দেখেছি।

'বললাম, দেখলে কি হবে? আনতে তো যেতে পারব না। কারণের কিছু করতে পারব না আমরা। ওর কাছে পিস্তল আছে। নকুল বলল, আনতে যাচ্ছেটা কে? ও আমাদের খুন করার মতলব আঁটছে যখন, আমরাই বা ওকে ছাড়ব কেন? ও যখন ঘুমিয়ে থাকবে মাথায় বাড়ি মেরে দেব ঘিলু বের করে। মালগুলো তখন আমরা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেব।

'নকুলের মিষ্টি কথায় ভুললাম না। বুঝলাম, কারণকে মারার পর নকুল আমাকেও ছাড়বে না। পুরো মাল সে একাই মেরে দিতে চাইবে। নকুলের কাছ থেকে জেনে নিলাম কোন্ জায়গাটায় মাল লুকিয়েছে কারণ।

'নিজেকে বাঁচানোর পথ খুঁজতে লাগলাম। নকুল ঘরে চলে যেতেই এক দৌড়ে গিয়ে ব্যাগটা গর্ত থেকে তুলে নিয়ে একটা শিয়ালের গর্তে ভরে ফেললাম। এমন করে মাটি চাপা দিয়ে রাখলাম যাতে কিছু বোঝা না যায়। কারণ যে গর্তে ব্যাগ রেখেছিল সেটাকেও আবার আগের মত করে মাটি দিয়ে বুজিয়ে রাখলাম।'

দম নেয়ার জন্যে থামল অশোক।

আগ্রহে ফেটে পড়ছে শ্রোতারা।

তারপর কি হলো, মুসা যখন জিজ্ঞেস করতে যাবে, আবার বলতে শুরু করল অশোক, 'খানিকক্ষণ দ্বীপের এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে, কেবিনে ফিরে এসে দেখি তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে কারণ আর নকুল। নকুলের আঙুলে একটা হীরা বসানো সোনার আংটি। সেটা দেখেই খেপেছে কারণ। চোর বলে গালাগাল দিচ্ছে। নকুল যতই বলছে,

রাতে শুধু আংটিটাই বের করেছিল সে, আর কিছু নেয়নি, রাগ ততই চরমে উঠছে কারণের। বিশ্বাস করছে না। শেষে পিস্তল বের করে চিৎকার করে উঠল, বেঈমান! চোর! তোকে আমি ছাড়ব ভেবেছিস! নকুলের বুক সই করে ট্রিগার টিপে দিল সে। ওখানেই পড়ে মরে গেল নকুল।'

আনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'বড় ভয়ানক লোকের পাল্লায় পড়েছিলে তুমি!'

'তা তো পড়েইছিলাম,' বিষণ্ণকণ্ঠে বলল অশোক। 'নইলে কি আর আজ এই দশা হয় আমার! যাই হোক, নকুলকে মেরে আমার দিকে ফিরল কারণ। শাসাল, বেঈমানের কি শাস্তি দিই আমি নিজের চোখেই দেখলে। অতএব সাবধান। চলো এখন, লাশটাকে বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসি। শিয়ালে খেয়ে ফেলুক।'

'কি ভয়ঙ্কর!' শিউরে উঠল মুসা। 'লোকটা মানুষ না পিশাচ!'

'তারপর কি করল শোনো না,' অশোক বলল। 'লাশের ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল সে। মরা কুত্তা যেভাবে ফেলে দিতে যায় মানুষ। আমি ধরছি না দেখে গালাগাল শুরু করল। কি আর করব। নকুলের দুই হাত ধরে উঁচু করলাম তাকে। ফেলে দিয়ে আসার আগে তার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম। কারণ সেটা দেখল না। কিংবা দেখলেও না দেখার ভান করে থাকল। বলল, চলো তো দেখে আসি, চোরটা আর কি কি জিনিস সরিয়েছে।

'আমাকে নিয়ে গর্তের কাছে গেল সে। মাটি খুঁড়ে ব্যাগটা না দেখে পাগল হয়ে গেল। গালাগাল করে মরা নকুলের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগল। সে ধরেই নিল, ওই ব্যাগ নকুলই সরিয়েছে। খেঁকিয়ে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে, হাঁ করে দেখছ কি? খোঁজো না। খুঁজে দেখো কোথায় লুকিয়ে রেখে গেছে শয়তানটা। এরপর কি ঘটত কে জানে, তখনকার মত বেঁচে গেলাম কেবিনের মালিক ফিরে আসার কারণে।

'লোকটার নাম রজন মুনিআপ্পা। আন্দামানে বাড়ি। দু'জন লোককে দ্বীপে দেখে অবাক হলো সে। কারণ বলল, ট্রলার ডুবে যাওয়াতে দ্বীপে উঠতে বাধ্য হয়েছে। তাতে রজনের সহানুভূতিই পেলাম আমরা। রজন জানাল, দ্বীপটা সে সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়েছে। মাছের মৌসুমে শুঁটকি বানায় এখানে। শিয়ালগুলো তারই। পোষা শিয়াল। বনের মধ্যে খোলা ছেড়ে রাখে। প্রথমে এনেছিল এক জোড়া। অনুকূল জায়গা পেয়ে বংশ বাড়াতে বাড়াতে এখন অনেক হয়ে গেছে। এটাও তার জন্যে বেশ ভাল একটা ব্যবসা হয়েছে। এ

জাতের শিয়ালের খুব কদর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানাগুলোতে সাপ্লাই দেয় মোটা টাকার বিনিময়ে। শুটকির মৌসুম ছাড়া এখানে থাকে না সে। তবে মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে আসে শিয়ালগুলোর জন্যে। কারণ দ্বীপে কাঁকড়া, ঝিনুক, পাখির ছানা বা ডিম যা পায়, তাতে হয় না ওগুলোর।

'শিয়ালের খাবার দিয়ে আন্দামানে ফিরে যাওয়ার সময় কারুণ আর আমাকে তার বোটে করে নিয়ে যেতে চাইল রজন। ওভাবে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হলো কারুণকে, নইলে সন্দেহ করে বসত রজন। মেইনল্যান্ডে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় পুলিশকে জানাত। গোপনে আমাকে বলল, এক হিসেবে বরং ভালই হলো। ওখানে গিয়ে আরেকটা ট্রলার ভাড়া করে নিয়ে ফিরে আসব।

'কিন্তু আন্দামানে গিয়ে কারুণের সঙ্গে আর থাকলাম না। প্রথম সুযোগেই পালালাম। চলে গেলাম পোর্ট ব্লেয়ারে। হীরার আংটিটা বিক্রি করে ভাড়ার টাকা জোগাড় করলাম। মানুষ পাচারকারীদের সহায়তায় চোরাপথে ঢুকে পড়লাম বাংলাদেশের সীমানায়।'

'পাসপোর্ট নেই তোমার?'

'আছে। কিন্তু বৈধপথে ঢোকার সাহস পাইনি। পুলিশ যদি জেরা শুরু করত, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম, জবাব দিতে পারতাম না। তা ছাড়া চোরের মন পুলিশ পুলিশ। ইচ্ছেয়ই হোক আর অনিচ্ছেয়ই হোক, ডাকাতের দলে থেকে তাদের সহায়তা যে করেছি, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। যাই হোক, ঢাকায় ফিরে এসেও বাড়ি ফিরলাম না। বাবার মুখোমুখি আমি হতে পারব না। বাড়িতে ফোন করে জেনে নিয়েছি আমার বোন ফিরেছে কিনা। জানলাম, ফিরেছে। ওকে আসলে কিডন্যাপ করেনি শয়তান কারুণ। স্কুল থেকে বান্ধবীর বাড়ি চলে গিয়েছিল। মা জানত না বলে দুশ্চিন্তা করছিল। সে-খবরটা ঠিকই জেনে নিয়ে কারুণকে জানিয়েছিল নকুল শ্যাম। মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভয় দেখিয়েছিল।'

'হুঁ, কাকতালীয় ভাবে হলেও পরিস্থিতিটা তার পক্ষে চলে গিয়েছিল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তাহলে তুমি এখন কোথায় আছো?'

'হীরার আংটি বিক্রির টাকা কিছু অবশিষ্ট আছে আমার কাছে। চকবাজারের সস্তা এক বোর্ডিং হাউসে লুকিয়ে আছি।'

চুপ করল অশোক। ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেল। গ্লাসধরা হাতটা কাঁপছে তার।

সবাই চুপ। কেউ কোন কথা বলছে না।

কিশোরের দিকে তাকাল অশোক। 'আমার কথা বিশ্বাস করোনি?'

'প্রতিটি শব্দ করেছি,' জবাব দিল কিশোর । 'এ ধরনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমাদের কাছে এসেছ কেন? আমরা কি করতে পারি?'

'তোমরাই পারো,' অশোক বলল। 'জিনিসগুলো তুলে এনে মালিককে ফিরিয়ে দিতে চাই।'

'পুলিশকে জানালেই পারো। মালিক যদি কেস তুলে নেয়, পুলিশ তখন সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখবে ব্যাপারটা। তা ছাড়া পুলিশের সাহায্য নিলে সুবিধেও হবে তোমার। সহজেই দ্বীপে যেতে পারবে, জিনিসগুলো বের করে আনতে পারবে, কারুণও বাধা দেয়ার সাহস পাবে না।'

'কিন্তু তাতে আমার লাভটা কি হবে? প্রথমত, আমি যে দোষী নই, সেটা প্রমাণ করা কঠিন হবে। পুলিশকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারিও, তারা আমার সঙ্গে দ্বীপে যায়, লোকে ভাববে পুলিশ আমাকে ধরে চাপ দিয়ে আমার পেট থেকে কথা আদায় করেছে। আমাকে তখন আরও বেশি করে ডাকাত ভাবতে থাকবে। কিন্তু আমি যদি নিজে নিজে মালগুলো উদ্ধার করে এনে মালিককে দিই, মালিক তখন পত্রিকার মাধ্যমে আমার নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করবেন। আমার স্কুলের স্যারেরা বুঝতে পারবেন আসলে আমি দোষী ছিলাম না। বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই তখন আমার কথা বিশ্বাস করবে। যে কালিটা আমার গায়ে লেগেছে, ধুয়ে মুছে যাবে। কি, ঠিক বলিনি?'

'তা কিছুটা বলেছ। তবে পুলিশকে জানালেই ভাল হত। যাকগে। এখন আমরা কি করতে পারি?'

'তোমরা আমার সঙ্গে চলো। জিনিসগুলো বের করে আনতে আমাকে সাহায্য করো। আমি জানি, তোমরা সঙ্গে থাকলে কারুণ আমার কিছু করতে পারবে না।'

হাসল রবিন। 'আমাদের ওপর এত আস্থা?'

'হ্যাঁ। কারণের চেয়ে অনেক বড় বড় অপরাধীকে দমন করতে পুলিশকে সাহায্য করেছ তোমরা, অনেক কঠিন সমস্যা থেকে অনেককে বাঁচিয়েছ। তা ছাড়া, পুলিশ আমাকে যতটা না করবে, তারচেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করবে তোমাদের কথা।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'তোমার কি মনে হয়, কারুণ আবার যাবে সে-দ্বীপে?'

'যাবে তো বটেই। তবে কখন যাবে সেটা বলতে পারব না।'

'কিশোর, এখনও বসে আছিস তোরা! ঘড়ি দেখেছিস ক'টা বাজে?' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল কিশোরের মামীর কণ্ঠ। এত রাত পর্যন্ত ছেলেগুলো কি করছে দেখতে এসেছেন তিনি।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল সবার।

মুসা বলল, 'খাইছে! রাত দুটো বেজে গেছে!'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অশোকও আঁতকে উঠল। 'ওরিবাব্বা! তোমাদের ঘুমের বারোটা বাজালাম।'

'ও কিছু না,' হাসল কিশোর। 'এ রকম ঘুম নষ্ট করে অভ্যাস আছে আমাদের।'

'ও কে?' অশোককে দেখালেন মামী।

'আমাদের বন্ধু, মামী,' জবাব দিল কিশোর। 'অশোক ব্যানার্জি। পত্রিকায় আমাদের ছবি দেখে দেখা করতে ছুটে এসেছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস আরিফকে সালাম দিল অশোক।

'কিছু খাইয়েছিস ওকে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন মামী। 'না খালি পেটেই রেখে দিয়েছিস?'

'জ্বী, কোক খেয়েছি,' অশোক জবাব দিল।

'ও তো পানি। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তোমার। এত রাতে তো আর বাড়ি ফিরতে পারবে না। দেখি, রান্নাঘরে ঠাণ্ডা যা আছে, গরম করে দিচ্ছি।'

'না না, শুধু শুধু কষ্ট করতে যাচ্ছেন আপনি। আমার কিছু লাগবে না...'

'লাগবে তো বটেই। রাত জাগলে খিদে বেশি লাগে।' মামী চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

'তাহলে কি ঠিক করলে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল অশোক। 'যাবে আমার সঙ্গে?'

'দেখি, ভাবতে দাও। সকালে জানাব।'

'যা-ই জানাও, সেটা যেন হ্যাঁ হয়।'

'যদি যাইও, জোগাড়যান্ত্রি করতে তো সময় লাগবে। তুমি এ ক'দিন থাকবে কোথায়?'

'কেন, চকবাজারের বোর্ডিংটাতেই থাকব। তোমাদের চিনিয়ে দেব। প্রয়োজনে আমার সাথে দেখা করতে পারবে।'

তিন

পাঁচ দিন পরের ঘটনা।

'ওই যে, স্মিথ আইল্যান্ড!' বলে উঠল মুসা। প্লেনের ককপিটে বসা সে। হাতে জয়স্টিক ধরা। পাশে বসা কিশোর। 'ওটাই

ল্যান্ডফল আইল্যান্ড।'

'ম্যাপ অবশ্য তা-ই বলছে,' কিশোর বলল। মধ্য আন্দামানের একটা অখ্যাত বিমানঘাঁটি থেকে শেষ উড়েছে ওরা। ভাড়া করা এই ছোট বিমানটা নিয়ে। বহু পুরানো বিমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের মারলিন। সেজন্যে কম ভাড়াতে পেয়েছে।

পেছনের মেইন কেবিনে বসা রবিন আর অশোককে খবরটা জানিয়ে এল সে। এটাই ওদের গন্তব্য।

'মানিয়াফুরা গ্রামটা এখন খুঁজে বের করতে হবে,' মুসা বলল। 'অশোক বলেছিল না, ওখানে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড আছে। তবে কতটা ভাল হবে কে জানে!'

'তবু তো আছে,' কিশোর বলল। 'আন্দামানের টুরিস্ট ব্যবসাটা জমজমাট বলেই এ সব সুবিধাগুলো পাওয়া যাচ্ছে, নইলে তো মান্ধাতার আমলের বোট ছাড়া গতি ছিল না।'

আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছেছে গতকাল। এবার আর অবৈধ পথে আসেনি অশোক। তাই পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পেরেছে। ওখান থেকেই মারলিনটা ভাড়া করেছে ওরা। হাসুয়ান ট্র্যাভেলস নামে বড় একটা কোম্পানি আছে ওখানে। মোটা টাকা জামানত রেখে টুরিস্টদের কাছে ছোট বিমান, বোট এ সব ভাড়া দেয়।

খরচাপাতি সব জোগাচ্ছেন গহনার দোকানের মালিক নাজির আবদুল্লাহ। অশোক সেরাতে কথা বলার পরদিন দোকানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে তিন গোয়েন্দা। খুলে বলেছে সব ঘটনা। নাজির সাহেব ভদ্রলোক। বুঝেছেন সব। বিশ্বাস করেছেন। বলেছেন, মালগুলো ফেরত পেলে কেস তুলে নিতে রাজি আছেন তিনি। অশোকের শাস্তি মকুফ করার জন্যে সব রকম চেষ্টা করবেন কথা দিয়েছেন। এমনকি এই অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিশ কোটি টাকা অনেক টাকা। গোয়েন্দাদের সঙ্গে তাঁর নিজেরও আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের ঝামেলায় শেষ মুহূর্তে নিজের ফ্লাইট ক্যান্সেল করেছেন। দলপতি হিসেবে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন কিশোরের ঘাড়ে।

ভোরবেলা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রা করেছে গোয়েন্দারা। পথে লং আইল্যান্ডে নেমেছে। সেখানে ট্যাংকে তেল ভরে নিয়ে আবার ওড়াল দিয়েছে। গন্তব্য স্মিথ আইল্যান্ড। কখনও আন্দামানের উপকূল, কখনও ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছে ওরা। এখন চলছে উপকূল ঘেঁষে। নামবে মানিয়াফুরা গ্রামে। অশোকের কথামত এর কাছাকাছিই পাওয়া যাবে রাতুন দ্বীপ, যেখানে শিয়ালের গর্তে

লুকিয়ে রেখেছে ডাকাতি করা গহনার ব্যাগ।

স্মিথ আইল্যান্ডের ওপর পুরো এক চক্কর দেয়ার পর সাগরের কিনারে এক জায়গায় বেশ কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। ওটাই মানিয়াফুরা, অশোক জানাল। ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিল মুসা।

সাগরের কিনারে পানির কাছ থেকে আধমাইল মত ভেতরে সাদা একচিলতে সমতল জায়গা দেখা গেল। ওটাই যে রানওয়ে বোঝা গেল শেষ মাথায় বিমান রাখার বড় একটা ছাউনি আর উঁচু লোহার পাইপের মাথায় নিশান উড়তে দেখে।

সাবধানে সাদা চিলতেটার এক মাথায় প্লেন নামাল মুসা। পাকা রানওয়ে নয়। তবে মাটি খুব সমান বলে অসুবিধে হলো না। ছাউনিটার দিকে ছুটে গেল প্লেন।

কাছাকাছি পৌঁছতেই ছাউনির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। থেমে যাওয়া প্লেনের কাছে এসে দাঁড়াল। গোয়েন্দারা নামতেই হাত বাড়িয়ে দিল। ইংরেজিতে বলল, 'আমি মুরিয়া চৌহান। হাসুয়ান কোম্পানির মানিয়াফুরা ইনচার্জ। তোমাদের আসার খবর পেয়েছি। হেড অফিস থেকে রেডিওতে জানানো হয়েছে আমাকে। তোমাদেরকে সব রকম সহায়তা করার নির্দেশ রয়েছে আমার ওপর। তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?'

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে কিশোর, এ অঞ্চলের অনেকেই ইংরেজি জানে। ব্যবসার খাতিরে শিখেছে। বিভিন্ন দেশের টুরিস্ট আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। হাসল সে। মাথা ঝাঁকাল। হাতটা বাড়িয়ে দিল চৌহানের দিকে।

নিজেই মুসা, রবিন আর অশোকের সঙ্গে পরিচয় করে নিল চৌহান। লোকটা বেশ আন্তরিক। হাসিখুশি। কিশোরের দিকে ফিরল আবার সে। 'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'না। শান্তিতেই এসেছি।'

'প্লেনের দায়িত্ব এখন আমার। তোমরা স্বাধীন। কি করতে চাও?'

ছাউনির কাছে দাঁড়ানো একটা হেলিকপ্টার দেখাল কিশোর। 'ওটাও নিশ্চয় আপনাদের কোম্পানির?'

'হ্যাঁ।'

আনমনে নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। 'ভালই হলো। কাজে লাগানো যাবে।' চৌহানের দিকে ফিরল। 'এখানে কতদিন ধরে আছেন?'

'তিন বছর।'

'জায়গাটা তো তাহলে ভালমতই চেনা আপনার।'

'তা তো বটেই।'

'আমরা শখের গোয়েন্দা, হেডঅফিস থেকে কি সেটা জানানো হয়েছে?'

'তা হয়েছে। এখানে কি তদন্ত করতে নাকি? অবশ্য বলতে না চাইলে নেই।'

'না না, না বলার কিছু নেই। তা ছাড়া মনে হচ্ছে আপনার সাহায্য আমাদের দরকার হতে পারে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবে! এসো না আমার অফিসে। কফি খাওয়া যাবে।'

হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'কফির সঙ্গে যদি টফিও দেন তাতেও আমার আপত্তি নেই। একটানা প্লেন চালাতে চালাতে খিদেটা বেশ চাগিয়ে উঠেছে।'

হাসল চৌহান। 'এসো এসো।'

ছোট অফিস। তবে চেয়ারগুলো ভাল। আরাম করে বসল ওরা। স্টোভে কফির কেটলি চাপাল চৌহান। বিস্কুট বের করে দিল।

খেতে খেতে কিশোর বলল, 'দু'চার দিন থাকতে হতে পারে আমাদের। এখানে থাকা-খাওয়ার জায়গা আছে? হোটেল-টোটেল?'

'টুরিস্ট স্পট যখন, জায়গা তো থাকবেই। কৃষ্ণ রারাতুঙ্গার বোর্ডিং হাউস-কাম-জেনারেল স্টোর-কাম-পোস্ট অফিস। মিসেস মুনিয়া রারাতুঙ্গা রাঁধেও বেশ ভাল। তোমাদের অসুবিধে হবে না।'

'অসুবিধের কথা ভাবলে আর এই দূর মুল্লুকে আসতাম না,' হেসে বলল কিশোর। 'যাকগে। বোর্ডিং হাউসটা দেখাবেন? সীট বুক করে ফেলতাম।'

'চলো, যাই। অফিসে আপাতত কোন কাজ নেই আমার। তোমাদের সঙ্গে ঘুরতে বরং ভালই লাগবে।'

হাঁটতে হাঁটতে কিশোর বলল, 'ভাবছি, রাতুন দ্বীপটায় এক চক্কর দিয়ে আসব। চেনেন তো নিশ্চয়।'

'ওই তো,' হাত তুলে সাগরের মাঝের কালো স্তূপের মত একটা জিনিস দেখাল চৌহান।

'এত কাছে হবে তা ভাবিনি। আচ্ছা, কারণ শিকদার নামে কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আপনার?'

'না। তবে কিছুদিন আগে ওই নামের একটা লোক এসে উঠেছিল মানিয়াফুরায়, এ খবর পেয়েছি। কেন, কিছু করেছে নাকি?'

'করেছে। দুই-দুইটা খুন। ওর কথা সব পরে বলব আপনাকে। আরেকজনকে তো নিশ্চয় চিনবেন, তিন বছর ধরে আছেন যখন। রজন মুনিআপ্পা। চেনেন?'

মুখের ভঙ্গি বদলে গেল চৌহানের। 'চিনতাম। এখানেই বাড়ি

ছিল।'

'এখন কোথায় গেল?'

'পরপারে। মারা গেছে।'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। চৌহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'মারা গেছে!'

'রাতুন আইল্যান্ডে যে লোকটা শুঁটকি বানাত, শিয়াল পুষত, তার কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ। কিভাবে মারা গেল? বুড়ো হয়েছিল বলে তো মনে হয় না।'

'ফেরেনি যখন, ধরে নিতে হবে মারাই গেছে। সাগরে ডুবে। এ সব অঞ্চলে বোট নিয়ে বেরিয়ে দীর্ঘদিন যদি কেউ না ফেরে, সবাই ধরে নেয় সে মারা গেছে।'

'খুলে বলবেন?'

'ওর একটা মোটর বোট ছিল। ভোররাতে সেটা নিয়ে বোধহয় দ্বীপে গিয়েছিল। ফেরেনি আর। কেউ তাকে আর দেখেনি। সাগরে উল্টে থাকতে দেখা গেছে তার বোটটা। হয়তো কুয়াশার মধ্যে পড়েছিল। চোরাপাথরে ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে বোট। স্রোতে ভেসে গেছে সে। অনেক কিছুই ঘটে থাকতে পারে।'

'অ!' নিচের ঠোঁটে ঘনঘন দু'তিনবার চিমটি কাটল কিশোর। 'খুন-খারাবি নয় তো?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল চৌহান। 'ধনী লোক ছিল না রজন। এমন কিছু তার ছিল না যেটার জন্যে কেউ খুন করতে পারে তাকে। লোকও খুব ভাল ছিল। কোন শত্রু ছিল না তার।'

'দ্বীপে কি একা গিয়েছিল নাকি সে?'

'হ্যাঁ। শুঁটকির মৌসুম ছাড়া সাধারণত একাই বেরোত সে, শিয়ালগুলোকে খাবার দিয়ে আসতে।'

'এ ঘটনার পর রাতুন দ্বীপে গেছে আর কেউ?'

'আমার জানামতে যায়নি। রজনের ছোট ভাই সজন, অবিবাহিত নিঃসন্তান ভাইয়ের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। পোর্ট ব্লেয়ারে থেকে ব্যবসা করে। ভাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শুনে একবার এসেছিল। দু'তিন দিন থেকে চলে গেছে। রজনের এখানকার বাড়িটা খালিই পড়ে আছে এখন।'

'আপনি কখনও রাতুন দ্বীপে গেছেন?'

'উঁহুঁ।'

'জেলেরা যায় না? আমি বলতে চাইছি, সাগরে বেরিয়ে মাছ ধরে ফেরার পথে কোন কারণে কেউ নামে না ওই দ্বীপে?'

'নামা তো দূরের কথা, ওটাকে এড়িয়েই চলে বরং সবাই। সব

সময় ভয়ানক স্রোত বয়ে যায় দ্বীপের পাশ দিয়ে, সামান্য বাতাসেই তখন উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে দ্বীপের পাথুরে দেয়ালে–এ সবই শোনা কথা। তা ছাড়া যখন তখন ঘন কুয়াশা সৃষ্টি হয়। সেটা অবশ্য এ অঞ্চলের সবখানেই হয়। ওই কুয়াশার মধ্যে দ্বীপের ত্রিসীমানায় যেতে চায় না কেউ। স্রোতের টানে গিয়ে দ্বীপের দেয়ালে ধাক্কা খেলে বড় বড় জাহাজও চুরমার হয়ে যাবে।'

'হুঁ, সাংঘাতিক জায়গা! শিয়াল চুরি করতে যায় না কেউ? যে ধরনের শিয়ালের কথা শুনলাম, তার চামড়ার অনেক দাম।'

'উঁহু। আর গেলেও গোপনে যাবে। চোরে কি আর সেটা মানুষকে জানিয়ে বেড়াবে যে জানব।'

ম্যানিয়াফুরা গ্রামটা ছোট গ্রাম। টুরিস্ট আসে বলে উন্নতির ছোঁয়া লাগছে। তবে তা-ও খুবই সামান্য। সাগরে পাথর ফেলে একটা জেটি বানানো হয়েছে। কয়েকটা মাছধরা নৌকা আর ট্রলার ঢেউয়ে দুলছে শেষ মাথায়। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আসে টুরিস্টরা। সেজন্যে হাসুয়ান কোম্পানি প্লেন নামার ব্যবস্থা করেছে। শীঘ্রি একটা মোটেল খোলারও ইচ্ছে আছে ওদের।

গাঁয়ের প্রান্তে সাগরের পাড়ে নারকেল গাছে ঘেরা একটা বাঁশ আর কাঠের তৈরি বাড়ি দেখাল চৌহান। নারকেল পাতার ছাউনি। বলল, 'রজনের বাড়ি।'

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখল কিশোর। তারপর আবার পা বাড়াল।

চৌহান বলল, 'রাতুন দ্বীপের ব্যাপারে খুব আগ্রহ তোমার। নিশ্চয় কোন কারণ আছে?'

'আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আর সেজন্যেই আমাদের এখানে আসা। ওখানে আমাদের যেতেই হবে। কি করে যাই, বলুন তো? উড়ে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই না বুঝতে পারছি, কিন্তু ল্যান্ড করার জায়গা পাওয়া যাবে?'

'প্লেন ল্যান্ড করার জায়গা আছে নাকি জানি না। হেলিকপ্টারে করে যেতে পারো। যদি বলো, নিয়ে যেতে পারি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই,' হাসল চৌহান। 'তোমাদেরকে সব রকম সাহায্য করার নির্দেশ আছে আমার ওপর, তখনই তো বললাম।'

'ওরকম একটা দ্বীপে কেন যেতে চাই, জানার নিশ্চয় খুব কৌতূহল হচ্ছে আপনার?'

'সত্যি কথা বলব? হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি কোন কথা নিজে থেকে বলতে না চায় তার কাছে জানতে চাওয়াটা অভদ্রতা।'

'আপনাকে সব বলব। কারণ আপনার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। কিছু না বললেও সর্বাত্মক সাহায্য পাবে আমার কাছ থেকে।'

জেটির দিকে মুখ করা বড় একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল চৌহান। 'এটাই কৃষ্ণ রারাতুঙ্গার বোর্ডিং হাউস। চলো, পরিচয় করিয়ে দেব। তারপর অফিসে যেতে হবে আমাকে। নিরাপদেই যে পৌঁছেছ তোমরা, জানাতে হবে হেড অফিসকে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার চৌহান...'

'আমাকে শুধু মুরিয়া বললেই চলবে। কিংবা চৌহান। যেটা সহজ লাগে। মিস্টার-ফিস্টারের দরকার নেই।'

'ওকে, চৌহান,' হাসল কিশোর। লোকটার আন্তরিকতা খুব ভাল লাগছে তার। 'ঠিক ছ'টার সময় চলে আসবেন। আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খাবেন। তারপর বারান্দায় বসে সাগর দেখতে দেখতে সব বলব আপনাকে।'

গোয়েন্দাদের নিয়ে বোর্ডিং হাউসে ঢুকল চৌহান।

ছোটখাট, হাড্ডিসর্বস্ব একজন মাঝবয়েসী মানুষকে বসে থাকতে দেখা গেল হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারে। অনেক লম্বা নাক লোকটার। মাথা ভর্তি চুল। বেখাপ্পাই লাগে। কিন্তু হাসিটা বড়ই সুন্দর। কৃষ্ণ রারাতুঙ্গা।

চার

'কেমন আছো, কৃষ্ণ,' চৌহান বলল। 'কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে পরিচয় করাতে। বহুদূর থেকে এসেছে ওরা। বাংলাদেশ। কয়েক দিন থাকবে। ঘর খালি আছে নাকি তোমার?'

'আছে তো বটেই। তোমার বন্ধু আমারও বন্ধু। কিন্তু ঘর তো সব সিঙ্গল বেডের চৌকি। থাকতে কষ্ট হবে না তো?'

'আরে নাহ্,' হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'শোয়ার জায়গা যে পেলাম, সেটাই কত না। আবার বাছাবাছি।'

'নাও হয়ে গেল তোমাদের থাকায় জায়গা,' গোয়েন্দাদের বলল

চৌহান। 'থাকো তোমরা। চলি। দেখা হবে।'

'ওহ্‌হো,' কিশোর বলল, 'আমাদের ব্যাগ-সুটকেসগুলো তো সব প্লেনে রয়ে গেছে।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল, 'চলো, যাই আবার!'

'তোমাদের আর যাওয়া লাগবে না,' চৌহান বলল। 'আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

বেরিয়ে গেল চৌহান।

এতক্ষণে পুরো ঘরটা দেখার সুযোগ পেল কিশোর। মাঝারি আকারের হলরুমের মত একটা কাঠের ঘর। কাঠের চেয়ার-টেবিল। একধারে বারও আছে। দেয়াল ঘেঁষে কাঠের তাকে দেশী-বিদেশী কিছু মদের বোতল সাজানো। নানা দেশ থেকে বহু ধরনের লোক আসে এখানে। তাদের জন্যে রেখেছে।

কফি দেবে কিনা জিজ্ঞেস করল রারাতুঙ্গা।

মাথা নাড়ল মুসা, 'উঁহুঁ, খেয়ে এসেছি। বরং পানি দিন। গলা শুকিয়ে গেছে।'

'ডাবের পানি খাবে? খুব ভাল লাগবে।'

'দিন।'

চাকরকে ডেকে ডাব কেটে এনে দেয়ার হুকুম দিল রারাতুঙ্গা।

একটা লম্বা কাঠের টেবিল ঘিরে সাজানো চেয়ারগুলোতে বসল ওরা। সময় নষ্ট না করে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা শুরু করে দিল কিশোর। রারাতুঙ্গাকে বলল, 'এখানে একটা কাজে এসেছি আমরা। ঠিক বেড়াতে নয়। কারুণ শিকদার নামে কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল রারাতুঙ্গা। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। 'তোমার কিছু হয় নাকি?'

'না না, তা হতে যাবে কেন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রারাতুঙ্গা। 'শুনে খুশি হলাম।'

'কেন?'

'ওর মত একটা শয়তানের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নেই বলে। তোমাদেরকে ভাল ছেলে মনে হচ্ছে। ও তো একটা খটাশ। ছুঁচোর চেয়ে খারাপ।'

হাসল কিশোর। 'ছুঁচো প্রাণীটা কিন্তু খারাপ না। তবে দুর্গন্ধ বেরোয়।'

'কারুণের তারচেয়ে বেশি দুর্গন্ধ। যাই হোক, ওকে খুঁজতে এসে থাকলে লাভ হবে না। পাবে না এখানে। নেই। ফিরবেও না কোনদিন।'

'তারমানে জ্বালিয়ে রেখে গেছে আপনাদের?'

'জ্বালিয়েছে মানে! সাতদিন ধরে ছিল। ঘরে থেকেছে, আমার খাবার খেয়েছে, টাকাও ধার নিয়েছে। তারপর কোন কিছু না জানিয়ে, আমার কোন পাওনাই না চুকিয়ে, চুরি করে একদিন কেটে পড়েছে।' প্রচণ্ড রাগে জানালা দিয়ে থুতু ফেলল রারাতুঙ্গা। 'কিন্তু ওরকম একটা লোককে খুঁজতে এলে কেন?'

'পুলিশও খুঁজছে ওকে। আপনাকে পরিচয়টা দিয়েই রাখি, আমরা শখের গোয়েন্দা।'

'অ, তাই বলো,' খুশি হলো রারাতুঙ্গা। 'তাহলে তো তোমাদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখো, ধরতে পারো নাকি ছুঁচোটাকে। আমার সাধ্যমত সাহায্য আমি করব।'

'আপাতত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে সহায়তা করুন,' সুযোগটা হাতছাড়া করল না কিশোর।

'বলো?'

'কারণ এখানে কিভাবে এসেছিল আপনি জানেন?'

'রজন ওকে নিয়ে এসেছিল এখানে। আমাকে বলেছিল লোকটাকে চেনে না সে। দু'দিন নিজের বাড়িতে রেখেওছিল। ব্যবসার কাজে মিলারস টাউনে যাওয়ার কথা ছিল রজনের। কারণকে তখন আমার এখানে থাকতে বলে সে। দিন কয়েক চলার জন্যে তাকে কিছু টাকাও দিয়েছিল।'

'এখানে যখন ছিল সময় কাটাত কি করে কারণ?'

'বেশির ভাগ সময়ই ঘুরে বেড়াত। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, তার এক কিশোর বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে-ও নাকি তার সঙ্গে নৌকাডুবির শিকার হয়েছিল। কারও কাছ থেকে একটা বোট ধার নেয়া যায় কিনা, সে-চেষ্টা চালাচ্ছিল। চিঠিও লিখেছিল কয়েকটা।'

'কার কাছে জানেন?'

'না। জিজ্ঞেস করিনি। তবে সে নিজেই জানিয়েছে ঢাকায় তার এক বন্ধুকে লিখছে টাকা পাঠানোর জন্যে। ওই টাকা এলে আমার টাকা দিয়ে দেবে বলেছিল।'

'টাকা এসেছিল?'

'জানি না। ও আগ বাড়িয়ে কখনও কিছু বলত না, নিজের সম্পর্কেও না, কোন কিছুর ব্যাপারেই না।'

'হুঁ!'

'কোন্ দেশী লোক ও?'

'জানি না। ইনডিয়ানও হতে পারে, বাংলাদেশীও হতে পারে।

খারাপ লোক সব দেশেই থাকে।'

'তা ঠিক,' রারাতুঙ্গা বলল। 'একদিন ঘুরতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেল। আর ফিরল না। মিথ্যুক, চোর কোথাকার।'

'কোথায় গেছে কোন ধারণাই নেই আপনার?'

'না। কেউ তাকে যেতে দেখেনি। এমনভাবে চোরের মত পালিয়ে চলে গেছে। তবে তাতে আমার দুঃখ নেই। বরং শয়তান লোক, আগেভাগেই যে চলে গেছে সেটাই বাঁচোয়া। যত বেশি দিন থাকত, তত ক্ষতি করত।'

'ওর ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানে?'

এক মুহূর্ত ভাবল রারাতুঙ্গা। মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় জানতে পারে, নাইয়ার বাঙ্গো। ও এখানকার স্থানীয় লোক নয়। কোনখান থেকে এসেছে তা-ও ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ান হবে সম্ভবত। মিশ্র রক্তও হতে পারে। গাঁয়ের বাইরে একটা ডেরা বেঁধে বাস করে। বহু বছর ধরে আছে। টাকা পেলে যে কোন কাজ করে দিতে রাজি। ওর চোখে সবই পড়ে। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখব।'

অন্য প্রসঙ্গে গেল কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো—রজন মুনিআপ্পার কি হয়েছে বলে আপনার ধারণা?'

মাথা নাড়তে নাড়তে রারাতুঙ্গা জবাব দিল, 'বলা কঠিন। যাওয়ার কথা ছিল মিলারস টাউনে। কিন্তু কেন যেন মত বদলে রাতুন দ্বীপে চলে গিয়েছিল। হয়তো শিয়ালের খাবারে টান পড়বে ভেবে ওগুলোকে খাবার দিতেই গিয়েছিল। ভোরবেলা আলো ফোটার আগে রওনা দিয়েছিল বলে সেদিন ওকে যেতে দেখেনি কেউ। ওর বোটটা ঘাটে ছিল না, সবাই তাই ধরে নিয়েছিল দ্বীপেই গেছে। এ ছাড়া বোট নিয়ে আর কোথাও যাওয়ার কথা নয় তার।'

'কি ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করেন?'

'ওখানে সাগরের যা অবস্থা, যা খুশি ঘটতে পারে।'

'রাতুন দ্বীপে আটকা পড়েনি তো?'

'মনে হয় না। খারাপ কিছুই ঘটেছে ওর। রজনকে আর কোনদিন ফিরে পাব না আমরা। বেচারা। সত্যিই খুব ভাল লোক ছিল।'

কিশোরদের মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল একটা লোক। এ ধরনের কাজে এলে বেশি জিনিস বহন করে না ওরা। তাই একজনের পক্ষে নিয়ে আসা কঠিন হয়নি।

আপাতত আর কোন প্রশ্ন নেই। ওদেরকে ঘরে পৌঁছে দিল রারাতুঙ্গা। বলল, হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিতে। খাবার রেডি করে ডাক দেবে।

সময়মতই হাজির হয়ে গেল মুরিয়া চৌহান। খাওয়া রেডি হয়ে গেছে ততক্ষণে। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় লম্বা টেবিলে খেতে বসল সবাই। বেশির ভাগই মাছ। তবে চমৎকার রান্না। গোগ্রাসে গিলল ওরা। সবশেষে এল কফি। আন্দামানে কফির চাষ হয়। তাজা কফির স্বাদই আলাদা।

কফি খেতে খেতে চৌহানকে কারুণের সব কথা খুলে বলল কিশোর। শেষে বলল, 'আমার বিশ্বাস, বেশি দূরে যায়নি কারুণ। আশেপাশেই কোথাও রয়েছে।'

চুপ করে রইল চৌহান। স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিশোর বলল, 'তৃতীয় আরও একটা খুন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আর সেই খুনটাও আপনাদের এলাকাতেই হয়েছে।'

'কার কথা বলছ? রজন?'

'হ্যাঁ।'

'কারুণকে সন্দেহ করছ?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ কারুণের চরিত্র সম্পর্কে যা শুনলেন, তাতে ওর ওপর সন্দেহ যাওয়াটা স্বাভাবিক না?'

মাথা ঝাঁকাল চৌহান। অশোকের দিকে তাকাল। আবার ফিরল কিশোরের দিকে, 'তাহলে সেই ডাকাতির মালই উদ্ধার করতে এসেছ তোমরা। বোটে যাবে না হেলিকপ্টারে?'

'হেলিকপ্টারটা হলেই সুবিধে হয়।'

'ঠিক আছে। পাবে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দ্বীপে যাবেই কারুণ, তাতে কোন সন্দেহই নেই আমার। ডাকাতির মাল উদ্ধার করে আনার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে সে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' চৌহান বলল। 'ঠিক আছে, আমি এখন যাই। কাল সকালে চলে যেয়ো। হেলিকপ্টারে করে তোমাদেরকে দ্বীপে পৌঁছে দেব।'

'ক'টার সময় গেলে ভাল হয়?'

'যখন খুশি তোমাদের। তবে যত সকাল সকাল যেতে পারো।'

'সেই ভাল,' কিশোর বলল। 'আলো ফুটলেই চলে যাব।'

উঠে দাঁড়াল চৌহান। 'যাই। অনেকক্ষণ থাকলাম। হেড অফিস থেকে আবার কোন্ সময় যোগাযোগ শুরু করে কে জানে। সকালে দেখা হবে।'

ঘরের একপ্রান্তে নিচুস্বরে কথা বলছিল ওরা। অন্য প্রান্তে বসা রারাতুঙ্গার কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না। চৌহান বেরিয়ে যেতেই টেবিল পরিষ্কার করতে এল সে। জানাল, 'নাইয়ার বাঙ্গোর সঙ্গে কথা

বলেছি আমি। ঝুপড়িতেই ছিল ও। তেমন কিছু বলতে পারল না। তবে কারণকে ম্যানয়াফুরা ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে সে।'

'কিভাবে গেল? কোনদিকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হেঁটে গেছে। দক্ষিণে। বনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার পুরানো একটা পায়েচলা পথ আছে।'

'কি আছে ওদিকটায়?'

'কিছু না। অন্তত দশ মাইল পর্যন্ত কিছুই নেই। তারপর একটা খাঁড়ি আছে। জায়গাটার নাম রায়নাফুরা। কিছু বস্তি আছে। সামুদ্রিক মাছ টিনজাত করার একটা কারখানা আছে ওখানে।'

'তারমানে ওখান থেকে বেরোনোরও পথ আছে?'

'আছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে পনেরো দিন পর পর মিলারস টাউন থেকে স্টীমার আসে। প্যাসেঞ্জার থাকলে নামিয়ে দিয়ে যায়। ফেরার পথে মাছ, শুঁটকি এ সব নিয়ে যায়।'

'তারমানে কারণ ওই পথে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে?'

'তা পারে। এখান থেকে বেরোনোর সবচেয়ে সহজ পথ ওটাই।'

'মিলারস টাউনের নাম জানে নাকি কারণ?'

'না জানলেও জেনে নিতে কতক্ষণ। রজনও নিশ্চয় বলেছিল ওকে। ওখানে একটা এয়ারফীল্ড আছে, ব্রিটিশ আমলের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বানানো। টুরিস্ট আর ডাক আনা-নেয়ার কাজেই মূলত ব্যবহার হয়।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। 'মিলারস টাউনের সঙ্গে চৌহান যোগাযোগ করতে পারবে?'

'তা তো পারবেই। রেডিওর সাহায্যে। ওখানে পুলিশ ফাঁড়িও আছে। তাদের সঙ্গেও কথা বলা সম্ভব। মানিয়াফুরায় পুলিশের দায়িত্বও অনেকটা চৌহানই পালন করে। কোন কিছু হলেই রেডিওতে জানিয়ে দেয় পুলিশকে। পুলিশ তখন নিজে আসে, কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা নেয়।'

'থ্যাংকস, রারাতুঙ্গা,' কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'অনেক সাহায্য করলেন আপনি।'

রারাতুঙ্গা চলে গেলে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল কিশোর। নিচের ঠোঁটে তার ঘনঘন চিমটি কাটা দেখেই বোঝা গেল সেটা। মিনিট দুয়েক পর মুখ তুলে তাকাল অশোকের দিকে। 'চৌহানের বাড়িতে যেতে পারবে এখন? অন্ধকারে অসুবিধে হবে?'

'না হবে না।'

'তাহলে চলে যাও। চৌহানকে বলবে মিলারস টাউনের পুলিশের সাথে যেন কথা বলে। ওকে ওখানে দেখা গেছে কিনা খোঁজ নিতে

বলবে। তোমাকে পাঠাচ্ছি, তার কারণ, পুলিশ যদি কারুণের চেহারার বর্ণনা জানতে চায় তুমি দেখেছ, তুমি দিতে পারবে। আমরা কেউ পারব না। চৌহানকে বলবে সকালের মধ্যে জবাব চাই আমি।'

উঠে দাঁড়াল অশোক।

'ইচ্ছে করলে রবিন কিংবা মুসাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো,' কিশোর বলল।

'না, তার দরকার হবে না। মানিয়াফুরা আমার পরিচিত। সহজেই চলে যেতে পারব।'

অশোক বেরিয়ে গেলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'আমরা এখন কি করব?'

'ঘুমাব,' নির্দ্বিধায় বলে দিল মুসা। 'ভোরে উঠেই তো আবার বেরোতে হবে।'

'ঠিক,' রবিনও মুসার সঙ্গে একমত।

একমত কিশোরও।

পাঁচ

পরদিন আলো ফোটার আগেই বিছানা ছাড়ল গোয়েন্দারা। এয়ারপোর্টে রওনা হলো। গিয়ে দেখল তৈরি হয়ে বসে আছে চৌহান।

সাগরের দিক থেকে হাওয়া আসছে। বাতাসে শীত শীত ভাব। শীতের গরম কাপড় পরতে হয়েছে।

আবহাওয়ার অবস্থা জানতে চাইল কিশোর।

'ভালই,' চৌহান বলল। 'মোটামুটি।'

সাগরের ওপর পাতলা ধূসর কুয়াশার স্তর। মাছধরা নৌকাগুলোকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে।

'ওই যে কুয়াশা,' হাত তুলে বলল মুসা।

'ওই কুয়াশাকে খারাপ বলা যাবে না,' চৌহান বলল। 'তবে এখানকার আবহাওয়ার মতিগতির কোন ঠিক নেই। কখন যে কি ঘটিয়ে ফেলবে বোঝা মুশকিল।'

'তাড়াতাড়ি চলুন তাহলে,' কিশোর বলল। 'অবস্থা ভাল থাকতে থাকতেই পাড়ি দিয়ে ফেলি। মিলারস টাউনের খবর কি?'

'খোঁজ নিয়েছি। কারণ ছিল ওখানে কিছুদিন। তার কয়েকজন বন্ধুর নাকি একটা বোট নিয়ে আসার কথা ছিল।'

'গিয়েই বন্ধু পেয়ে গেল। চমৎকার! বোটটা এসেছিল?'

'হ্যাঁ। সেটাতে চড়তে শেষ দেখা গেছে ওকে। স্মিথ আইল্যান্ডের দিকে চলে গেছে হয়তো।'

'ওখানে যাবে কেন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। চৌহানকে জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি ওটার? কি ধরনের বোট?'

'মাতাঙ্গা। মোটর ক্রুজার।'

'ওর বন্ধুরা কারা জানতে ইচ্ছে করছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় ওরাও কারণের মত একই চিজ।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল চৌহান। 'এটা ভেবে দেখিনি। যাকগে। যা খুশি করুকগে ওরা। আমাদের কাজ আমরা করি। চলো।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

হেলিকপ্টারটা ফোর-সীটার। পেছনে বসল মুসা আর রবিন। অশোকের পাতলা শরীর বলে দু'জনের মাঝখানে ঢুকতে পারল কোনমতে। তবু ঠাসাঠাসি করেই বসা।

ওড়াল দিল কপ্টার। প্লেনে করে আসার সময়ই নিচের প্রাকৃতিক পরিবেশটা দেখেছিল গতকাল তিন গোয়েন্দা। উত্তর আন্দামানের বেশির ভাগটাই ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। পাহাড়-পর্বত টিলা-টক্কর প্রচুর। মাছ আর শুঁটকি ছাড়াও এখান থেকে দামী কাঠ, নারকেল, নারকেলের ছোবড়া, চা, কফি, রবার রপ্তানী হয়। সেগুন কাঠের জঙ্গল, নারকেলের জটলা দেখা যাচ্ছে ওপর থেকে। পাহাড়ের ঢালে চা বাগান। রবার আর কফি গাছগুলো ওপর থেকে অত পরিষ্কার নয়। সাগরে অসংখ্য মাছধরা নৌকা, ট্রলার, জাহাজ ঘোরাফেরা করছে। রাতেই প্রধানত মাছ ধরা হয়। সকালের দিকে এখন জলযানগুলো বন্দরের দিকে ফিরে যাচ্ছে সেই সব মাছ পাইকারদের কাছে কিংবা মাছ বিক্রেতা কোম্পানিগুলোর কাছে বিক্রি করতে।

রাতুন দ্বীপে পৌঁছতে সময় লাগল না। পাখি ছাড়া আর কোন প্রাণী চোখে পড়ল না ওদের। ওপর থেকে মস্ত একটা লম্বাটে বাসনের মত লাগছে দ্বীপটাকে। এখানে ওখানে পানি জমে থাকতে দেখা গেল। সেগুলো ডোবা না জলাভূমি বোঝা গেল না। মাটি অতিরিক্ত নরম হলে হেলিকপ্টার নামানো ঝুঁকিপূর্ণ।

বাসনের পেটের কাছে পানিশূন্য একটা জায়গায় হেলিকপ্টার নামাল চৌহান। মাটি কেমন বোঝার চেষ্টা করল। চাকার নিচে নরম কাদামাটি টের পেলেই উঠে পড়বে। তবে মাটি মনে হলো শক্তই।

পাথুরে।

দরজা খুলে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গেল কিশোর। লাফালাফি করে, পা দিয়ে ঠুকে মাটি পরীক্ষা করে দেখে ইঞ্জিন বন্ধ করতে ইশারা করল চৌহানকে।

ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেলে চৌহানকে বলল, 'মাটি আপাতত শক্তই আছে। তবে বৃষ্টি নামলে কি হবে বলা কঠিন। তখন বিপদ হতে পারে। চতুর্দিকের পাহাড় থেকে পানি গড়িয়ে নেমে আসে নিচের দিকে, বোঝাই যায়। এই যে, সবখানে জলজ শ্যাওলা জন্মে রয়েছে।'

'কি করব তাহলে?'

জবাব দেয়ার আগে অশোকের দিকে তাকাল কিশোর। 'শিয়ালের গর্তটা কতদূরে?'

'মাইলখানেক হবে। বেশিও হতে পারে।'

চৌহানকে বলল কিশোর, 'আপনি ইচ্ছে করলে অপেক্ষা করতে পারেন। জিনিসগুলো বের করে নিয়ে আসি আমরা। কিংবা চলেও যেতে পারেন। পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।'

'কতক্ষণ লাগবে তোমাদের?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। এলাম যখন, রজন মুনিআপ্পাকেও খুঁজব আমরা। তার কেবিনে যাব। তার নিখোঁজ হওয়ার রহস্যটা ভেদ করতে হবে।'

'ও, তাহলে তো দেরিই হবে,' চৌহান বলল। 'তবে ঠিক চিন্তাই করেছ। ওর কি হয়েছে, সত্যিই জানা দরকার।'

'নাকি আমাদের সঙ্গে আসবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এক মুহূর্ত ভাবল চৌহান। 'নাহ্। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসতে পারে। টুরিস্টরাও কখন কে চলে আসে ঠিক নেই। আমি বরং চলেই যাই। তোমাদের নিতে দুপুর নাগাদ ফিরে আসব। এই বারোটার দিকে। কি বলো?'

'সেই ভাল।'

চৌহান বাদে নেমে পড়ল সবাই। আবার ঘুরতে শুরু করল হেলিকপ্টারের রোটর। বিশাল একটা গঙ্গা ফড়িঙের মত শূন্যে উঠল মেশিনটা। একটা ঝাঁকি দিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। বিচিত্র ভঙ্গিতে কোনাকুনিভাবে কাত হয়ে উড়ে গেল সাগরের দিকে।

হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাল গোয়েন্দারা।

অশোকের দিকে ফিরল কিশোর। 'চলো। পথ দেখাও।'

'গর্তটার কাছে যাব সোজা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম পথে একবার কেবিনটা দেখে যাওয়ার কথা বলবে। বেশি দূরে না অবশ্য।'

'বেশ, তাহলে তাই করা যাক। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাগটা তুলে নেয়া দরকার। ভাবছি, এতখানি পথ এলাম যেটার জন্যে, সেটা আছে তো জায়গামত?'

'আছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল অশোক। 'যদি না শিয়ালের গহনা পরার শখ হয়।'

তার রসিকতায় হাসল না কিশোর। 'গুপ্তধন উদ্ধারের অভিজ্ঞতা নেই তো তোমার, তাই জানো না। কোনভাবেই যেন সহজে হাতে আসতে চায় না এ ধরনের জিনিস, যেন ভূতে আসর করে থাকে, খালি অঘটন ঘটে।'

'এবারে ঘটবে না। আমি বলে দিলাম, দেখো।'

কেউ আর কিছু বলল না। সমতলভূমির প্রান্তসীমায় সবচেয়ে কাছের বনটার দিকে এগিয়ে চলল অশোক। জায়গাটা এত নরম কাদায় ভরা, বড় বড় গাছগুলো শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে কি করে সেটাই আশ্চর্য। জলজ শ্যাওলার বাড়াবাড়িই বলে দেয় মাটির সামান্য নিচেই পানি রয়েছে। মাটির ওপরেও যেখানে সেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকার মত করে পানি জমে রয়েছে। পানি ভেঙে যেতে হচ্ছে ওদের।

'ভাগ্যিস এখানে প্লেন নিয়ে আসিনি আমরা,' রবিন বলল। 'নামলে আর উঠতে পারতাম না।'

'বলা যায় না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'একেবারে নিচের দিকে রয়েছি তো আমরা, তাই জলা আর কাদা পাচ্ছি। ওপরের দিকটায় নিশ্চয় শুকনো। শক্ত। প্লেনে বোঝাটোঝা বেশি না থাকলে হয়তো নামা যাবে।'

বনের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। একটা পায়েচলা পথ বেছে নিল অশোক। রাস্তাটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে দ্বীপের বাসনের মত কানার দিকে।

কিছুদূর এগোনোর পর পাতলা হয়ে এল গাছপালা। ঢালের গায়ে এক টুকরো খোলা জায়গায় কাঠের তৈরি কেবিনটা চোখে পড়ল। সাগরের দিকে মুখ করা।

কাছে যেতে যেতে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল অশোক।

'কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর। 'কোন সমস্যা?'

'বুঝতে পারছি না,' ধীরে ধীরে বলল অশোক। 'আমরা সেবার চলে যাওয়ার পরেও কেউ এসেছিল এখানে।'

'কি করে বুঝলে?'

কেবিনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা খাবারের খালি টিন, বাক্স, মদের বোতল দেখাল অশোক। খাওয়ার পর নিতান্ত অবহেলায় জানালা কিংবা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

'দ্বীপের মালিক নিজেই হয়তো এসেছিল,' রবিন বলল।

মাথা নাড়ল অশোক। 'উঁহু। রজন মোটেও নোংরা স্বভাবের ছিল না। সব কিছু গোছগাছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখত। বাড়ির পাশে এ ভাবে জঞ্জাল বানিয়ে রেখেছে সে, বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'চলো, ঢুকে দেখা যাক,' এগিয়ে গেল কিশোর। সাবধানে জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। কাউকে না দেখে দরজার দিকে এগোল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। তালা নেই। দল বেঁধে ভেতরে ঢুকল সবাই।

ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়েই চিৎকার করে উঠল অশোক, 'রজনের কাজ হতেই পারে না! কি নোংরা!'

জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে একটা শুয়োরের খোঁয়াড় মনে হচ্ছে কিশোরের। মেঝের সর্বত্র কাদামাখা জুতোর ছাপ। জুতো পায়ে চেয়ারেও উঠেছিল কেউ। চুলার সামনে ছাই আর কয়লা ছড়ানো। খাবারের আলমারির দরজা হাঁ হয়ে খোলা। তাকগুলো শূন্য।

'কিছুই নেই,' বিড়বিড় করে বলল অশোক। 'কিচ্ছু না। অথচ আগেরবার যখন এসেছিলাম খাবারে বোঝাই ছিল। ঘরটা ছিল ঝকঝকে তকতকে।'

'নেকড়ের পাল হামলা চালায়নি তো?' মুসার প্রশ্ন।

'দূর, এখানে নেকড়ে আসবে কোত্থেকে?' কিশোর বলল। 'শিয়ালই বাইরে থেকে আনা হয়েছে। তা ছাড়া নেকড়েবাঘে সিগারেট খায় না।' মাটিতে পড়ে থাকা পোড়া সিগারেটের গোড়া দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'অশোক, রজন কোন্ ব্র্যান্ডের সিগারেট খেত?'

'কোন ব্র্যান্ডেরই না। সিগারেটই খেত না।'

নিচু হয়ে গোড়াটা তুলে নিল কিশোর। বাড়িয়ে দিল অশোকের দিকে, 'দেখো তো, এটা চিনতে পারো নাকি?'

'কারূণ!' ফিসফিস করে বলল অশোক। 'এই দুর্গন্ধে ভরা ভয়ানক কড়া ব্র্যান্ড কারূণের প্রিয়!'

'তারমানে তুমি ভাবছ কারূণ এসেছিল এখানে?' মুসার প্রশ্ন।

'তা ছাড়া আর কে?' জবাব দিল কিশোর। 'আর একাও আসেনি সে। জুতোর ছাপগুলো দেখো। আলাদা রকম।'

'নিশ্চয় গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে,' মুসা বলল।

'মিলারস টাউন থেকে বোট নিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে।

কিন্তু কথা হলো, তুলে নিয়ে যায়নি তো ওগুলো? অশোক, জলদি চলো। কোথায় লুকিয়েছ, দেখাও।'

অশোকের মুখে উদ্বেগ। শঙ্কার ছায়া। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

এক সারিতে তার পেছনে চলল পুরো দলটা।

কিছুদূর এগোনোর পর পাথরের একটা ছোট স্তূপ দেখিয়ে অশোক বলল, 'প্রথমে ওখানে লুকিয়েছিল কারুণ।'

'এগিয়ে যাও,' তাগাদা দিল কিশোর। 'ওটা দেখার দরকার নেই।'

আবার এগোল অশোক। কিছু গাছের জটলা, দু'চারটা উঁচুনিচু ঢিপি পেরোনোর পর যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর।

হাত তুলে দেখাল অশোক। 'ওখানে···ওই জায়গাটায় লুকিয়েছিলাম···!' কথা বেরোতে চাইছে না যেন মুখ দিয়ে।

একটা ঢালু জায়গার ওপর আটকে গেছে যেন চার জোড়া চোখ। মাটির ভাঙন, ছড়ানো পাথর, উল্টে থাকা ঝোপঝাড় আর গাছের শিকড়ই বলে দিচ্ছে ধস নেমেছিল ওখানে।

'ধ-ধ-ধস্···' তোতলানো শুরু করল অশোক।

'দেখতেই তো পাচ্ছি,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'শিয়ালের গর্তটার যতটা সম্ভব কাছাকাছি যাও।'

'গ-গ-গর্তটা কোথায় ছিল, তাই তো বুঝতে পারছি না এখন!'

'খাইছে! কি হবে তাহলে?' বিড়বিড় করল মুসা।

অশোকের দিকে তাকাল কিশোর। 'তারমানে, তুমি বলতে চাইছ ওই ধস নামা মাটির স্তূপের নিচে কোথাও হারিয়ে গেছে জিনিসগুলো?'

'হ্যাঁ।'

'মন খারাপ করে লাভ নেই। ধস নামার জন্যে তুমি দায়ী নও।'

'কিন্তু এ রকম কিছু ঘটবে···'

তিক্ত হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'বলেছিলাম না, কোন গুপ্তধনই সহজে হাতে আসতে চায় না!'

ছয়

চিন্তিত ভঙ্গিতে ধস নামা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থেকে ঘনঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। তারপর অশোককে জিজ্ঞেস করল, 'শিয়ালের গর্তটা কোথায় ছিল, একেবারেই বুঝতে পারছ না?'

'চেষ্টা করলে হয়তো পারব,' জবাব দিল অশোক। 'গাছপালাগুলো উল্টে গিয়েই সর্বনাশটা করেছে। একেবারে বদলে দিয়েছে জায়গাটার চেহারা।'

'হুঁ। ভাল একটা ঝামেলায় পড়লাম। আজ আর খোঁজার সময় নেই। সঙ্গে শাবল-কোদালও নেই আমাদের যে খুঁড়ে দেখব।'

'কারুণ যদি আসে?'

'এলে কি হবে? কোথায় খুঁজবে? গর্তটা কোথায় আছে জানা ছিল তোমার, তা-ও চিনতে পারছ না এখন। আর ও তো জানেই না। সুতরাং সুবিধার দিক থেকে তার চেয়ে এগিয়ে রয়েছি আমরা।'

মুসা বলল, 'তা ছাড়া কেবিনের খাবার তো সব সাফ করে ফেলেছে। খাবার আনতে কিছু সময়ের জন্যে হলেও অন্য কোথাও যেতে হবে তাকে।'

'হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা,' কিশোর বলল। 'তবে ভাল একটা ঝামেলায় পড়লাম। এই মাটি-পাথর আর গাছপালার স্তূপ সরানো সোজা কথা নয়।' ঘড়ি দেখল সে। 'চৌহানের আসার সময় হয়েছে। চলো। সব শুনলে সে-ও সাহায্য করতে পারবে আমাদেরকে।'

'কি জানি!' রবিন আর বিশেষ ভরসা করতে পারছে না।

'মানে?'

'আবহাওয়ার পরিবর্তন টের পাচ্ছো? সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখো।'

ভূমিধসের দিকে মনোযোগ থাকায় অন্য কোনদিকে নজর দিতে পারেনি এতক্ষণ কিশোর। ঘুরে তাকাল সাগরের দিকে। সাদা কুয়াশার চাদর সব কিছু ঢেকে দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। পেছনের কোন কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

'সর্বনাশ! জলদি চলো!' দ্রুত হাঁটতে শুরু করে দিল সে। 'চৌহানেরও নিশ্চয় চোখে পড়েছে এই কুয়াশা। সময় হওয়ার আগেই

তাহলে আমাদের তুলে নিতে চলে আসতে পারে।'

ছুটতে শুরু করল ওরা। কিন্তু কুয়াশার সঙ্গে পারল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল কুয়াশা। ওরা একশো গজ পেরোনোর আগেই, কেবিনটা চোখে পড়ার আগেই, ভেজা কুয়াশা ঘিরে ফেলল ওদের।

'সাবধান!' কিশোর বলল। 'বেশি কিনারে যেয়ো না। কিনার দিয়ে নিচে পড়ে গেলে শেষ। একে অন্যের হাত ধরে রাখো।'

হাত ধরাধরি করে লম্বা একটা মানব-শিকল তৈরি করে এক সারিতে এগোল ওরা। সাবধানে। ধীরে ধীরে।

'উঁহু, লাভ হচ্ছে না,' কিশোর বলল। 'এ ভাবে চলতে থাকলেও বিপদ এড়াতে পারব না। পাহাড় থেকে পড়ে কিংবা চোরাকাদায় ডুবে মরতে হবে। অন্ধের মত হাতড়ে বেরিয়ে কপ্টার ল্যান্ডিঙের জায়গা খুঁজে পাব না। চৌহান আসবে না আমি শিওর। এই কুয়াশার মাঝে যে নামাও যাবে না, ওড়াও যাবে না, এটুকু বোধ নিশ্চয় ওর আছে। দ্বীপটাই দেখতে পাবে না, থাক তো আমাদের। যে হারে ছড়াচ্ছে এতক্ষণে নিশ্চয় এই কুয়াশা মেইনল্যান্ডেও চলে গেছে। সব কিছু বাদ দিয়ে এখন কেবিনটা খুঁজে বের করা দরকার আমাদের। ওটার মধ্যে ঢুকতে পারলেই কেবল বাঁচব।'

'ভাবছি, কতক্ষণ থাকবে এই জঘন্য কুয়াশা!' মুসা বলল।

'বলা অসম্ভব,' জবাব দিল রবিন। 'এই কুয়াশার কথা যতটুকু পড়েছি, দুই ঘণ্টাও থাকতে পারে, কিংবা দুই হপ্তা; সবই নির্ভর করে স্রোত, বাতাসের গতিবিধি আর তাপমাত্রার পরিবর্তনের ওপর।'

'দারুণ খবর শোনালে,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'আসার আর জায়গা পেল না যেন কারণের ট্রলার। ঝড়ে পড়েছিল ভাল কথা, কিন্তু ভাল কোন জায়গায় ভেসে যেতে পারল না? মাইকেল ব্যালান্টাইনের প্রবাল দ্বীপের মত কোথাও। যত্তসব!' গজগজ করতে থাকল মুসা।

'ওসব বলে তো আর লাভ নেই,' থামিয়ে দিল কিশোর। 'বরং কেবিনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো।'

হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলল ওরা। অদ্ভুত এক সাদা অন্ধকারের জগতে প্রবেশ করেছে যেন। ভয়াবহ নীরবতা। মাঝেসাঝে একআধটা গালের তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভূতুড়ে সেই ডাক। বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে বোধহয় পাখিগুলো।

নিজেকে বেশ ভাল গাইড প্রমাণ করল অশোক। কোন রকম বিপত্তি ছাড়াই খুঁজে বের করল কেবিনটা। আশেপাশে ছড়ানো জঞ্জাল এ কাজে তাকে বিশেষ সহায়তা করল।

একে একে ঘরে ঢুকল সবাই। দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভেজা কপাল মুছতে মুছতে কিশোর বলল, 'চুলা ধরানো দরকার। হাত-পাগুলো অন্তত গরম করা যাবে।'

লাকড়ি আছে। চুলা জ্বালতে অসুবিধে হলো না। আগুনের কাছে আরাম করে বসল সবাই। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ কথা বলল না। বলার কিছু নেইও। বাইরে থেকে কোন রকম শব্দ আসছে না। ভূতুড়ে এক ধরনের নীরবতা নিয়ে হাজির হয়েছে আজব কুয়াশা। বিশাল এক তেরপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে যেন দ্বীপটাকে।

সময় কাটতে লাগল।

'এ ভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না আমার,' খাবারের তাকগুলোর দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'কিছুই কি ফেলে রেখে যায়নি? না খেয়ে মরতে রাজি না আমি।'

'দোষটা আমারই,' কিশোর বলল। 'কুয়াশার কথা, এ ধরনের অঘটনের কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল। খাবার না নিয়ে এ ভাবে দ্বীপে নামাটা মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম স্রেফ নামব আর গর্ত থেকে ব্যাগটা বের করে নিয়ে চলে যাব। অথচ হলোটা কি দেখো!'

'চৌহান কিন্তু বলেছিল এখানকার আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই,' রবিন বলল।

'নিশ্চয় কুয়াশার কথাই ইঙ্গিত করেছিল সে। আমি গাধাই খেয়াল করিনি।'

'যা হবার হয়েছে,' মুসা বলল। 'নিজেকে গালমন্দ করে এখন আর লাভ নেই।'

আবার চুপ থাকা।

দীর্ঘ নীরবতা।

অবশেষে নীরবতা ভাঙল মুসা, 'কিছুই কি করা যায় না? পেঁচার মত চোখ গোল গোল করে শুধুই আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকা, সইতে পারছি না আমি।'

'কি করবে?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'কিছু একটা। আর কিছু করার না থাকলে চিৎকার করে বেসুরো গলায় গান তো গাইতে পারব, সে-ও ভাল, এ ভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে।'

অশোক বলল, 'একটা কাজ অবশ্য করা যায়।'

আগ্রহী হয়ে তাকাল কিশোর। 'কি?'

'ধস নামা জায়গাটায় চলে যেতে পারি। বলা যায় না, হাতড়ে হাতড়ে বেরও করে ফেলতে পারি শিয়ালের গর্তটা। বাইরে থেকে

যতটা মনে হয়েছে, ওপরের মাটির স্তর অতটা পুরু না-ও হতে পারে।'

'জায়গাটাই খুঁজে পাবে না। শিয়ালের গর্ত তো দূরের কথা।'

'কেন পাব না? কেবিনটা কি খুঁজে বের করিনি?'

ভেবে দেখল কিশোর। 'পেলে সেটা বড়ই বিস্ময়কর একটা ঘটনা হবে। ঠিক আছে, বসে থাকতে চাও না যখন, চেষ্টা করতে দোষ কি? যাও। তবে দ্বীপের কিনারের পাহাড়ের দেয়াল থেকে দূরে থাকবে। যে রকম উঁচু। নিচে পড়লে ভর্তা।'

'কাছে গেলে ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাব।'

'অত কাছে যাওয়ারই দরকার নেই। দয়া করে পথ হারিয়ো না, তাহলেই আমি খুশি। এমনিতেই ভাল বেকায়দায় পড়েছি। তোমাকে খুঁজতে যাওয়ার ঝামেলায় ফেলো না আর।'

'ফেলব না,' কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল অশোক।

'শুধু শুধু কষ্ট করতে গেল,' রবিন বলল। 'কোনই লাভ হবে না।'

'ওর অস্থিরতাটা আমি বুঝতে পারছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ব্যাগটা খুঁজে বের করা আমাদের চেয়ে ওর জন্যে অনেক বেশি জরুরী। ওই জিনিসগুলোর কোন দাম নেই আমাদের কাছে, অথচ ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওগুলোর ওপর। তবে সত্যি কথাটা বলতে কি, ওগুলো না পাওয়া গেলেও অবাক হব না আমি এখন। আজ পর্যন্ত যতবার গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়েছি, কোনটাই প্ল্যানমত হতে দেখিনি। প্রথম দিকে মনে হয় খুব সহজেই পাওয়া যাবে; কিন্তু যায় না।'

'মন খারাপ করে লাভ নেই, কিশোর,' সান্ত্বনা দিল রবিন। 'ব্যাগটা পাওয়া যাবেই। দেখো তুমি।'

'লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবছি না আমি। কিন্তু এ ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে আমারও ভাল লাগছে না। অহেতুক সময় নষ্ট করা। সেজন্যেই রাগ হচ্ছে।'

আবার নীরবতা। এবার অনেকক্ষণ ধরে। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল একটা কথাও কেউ বলল না। দুই ঘণ্টা। একটু পর পরই উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কিশোর। বাইরে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে। একই রকম রয়েছে। কোন পরিবর্তন নেই। দৃষ্টি চলে না। দোরগোড়ায় সাদা রঙ করা দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়াশা।

ঘড়ির দিকে তাকাল একবার কিশোর। 'কোন্ বোকামি যে করতে গেছে অশোক, কে জানে!'

'আমি জানি কি করছে,' বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। দয়া করে আমাকে এখন খুঁজতে যেতে বোলো না।'

খানিক পরেই একটা শব্দ চমকে দিল ওদের সবাইকে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ। কিন্তু চাপা। কুয়াশার কারণেই বোধহয় এ রকম শোনাল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'কিসের শব্দ?'

'আমার কাছে তো গুলির শব্দ বলেই মনে হলো,' মুসা বলল।

'অশোকের কাছে পিস্তল নেই। আর থাকলেও লুকিয়ে রেখেছে, আমাদের জানায়নি।'

'ও পিস্তল পাবে কোথায়? আর এই কুয়াশার মধ্যে কিসের ওপর গুলি চালাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'শিয়াল খাওয়ার শখ হয়েছে হয়তো,' মুসা বলল। 'কিংবা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে শিয়ালের চামড়ার কোট চায়, সেই বুনো পশ্চিমের মত।'

'আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'আমারও,' একমত হলো কিশোর। 'অশোক গুলি চালিয়ে না থাকলে অন্য কেউ চালিয়েছে, তারমানে অন্য কেউ রয়েছে দ্বীপে।' ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সে, 'এটাই একমাত্র জবাব...'

থেমে গেল সে। বাইরে আরেকটা শব্দ হয়েছে। কেবিনের কাছেই। খাবারের খালি টিনে লাথি লেগেছে কারও। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কোন ধরনের একটা অস্ত্রের জন্যে চোখ বোলাল কেবিনের মধ্যে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল অশোক। চকের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ। গালের একপাশে রক্ত।

'কারুণ!' ফিসফিস করে বলল সে। 'দ্বীপেই আছে।'

'কি বলছ!'

'একা নয়। তার সঙ্গে আরও লোক আছে।'

'গুলি লেগেছে নাকি তোমার?'

'গাল ছুঁয়ে চলে গেছে। তাতেই যে রকম জ্বালা করে উঠল।'

'দেখি, সোজা হও তো। কতখানি লেগেছে দেখা যাক।' ক্ষতটা পরীক্ষা করল কিশোর। 'তেমন কিছু না। কি হয়েছিল?'

'ধসের কাছে ঠিকমতই চলে গিয়েছিলাম,' অশোক জানাল। 'পেছন থেকে এসে হাজির হলো ওরা।' কথা বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে এখনও অশোক। 'তিনজন। হাতে পিস্তল। কারুণ বলল, সে জানত, আমি ফিরে আসবই। ব্যাগটা কোথায় রেখেছি জিজ্ঞেস করল সে। এমন ভান করে রইলাম, যেন সে কি বলছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু এবার আর বোকা বানাতে পারিনি ওকে। পিস্তল তুলে শাসাতে লাগল, না বললে গুলি করে মারবে।'

'ব্যাগটা কোথায় লুকিয়েছ না বলা পর্যন্ত মারবে না সে,' কিশোর বলল। 'তোমাকে মেরে ফেললে ওটা কোথায় আছে জানতে পারবে না ও আর কোনদিন।'

'আমিই লুকিয়েছি, এখনও এ ব্যাপারে শিওর না সে। বুঝল কি করে বুঝলাম না।'

'তোমার দ্বীপে ফিরে আসাটাই সন্দেহ জাগিয়েছে তার,' কিশোর বলল। 'ওগুলোর জন্যে ছাড়া এই জঘন্য দ্বীপে আর কিসের আকর্ষণে আসতে যাবে তুমি না বোঝার মত বোকা নয় সে।'

'তা ঠিক।'

'তারপর কি করলে?'

'সোজা ঘুরে দৌড় মারলাম। কুয়াশা না থাকলে পারতাম না। গুলিটা কারণ করেনি। তার এক সঙ্গী করেছে। থামলাম না। সোজা কেবিনের দিকে ছুটলাম।'

'কারণের সঙ্গে ক'জন আছে বললে?'

'দু'জনকে দেখেছি।'

'ভাল গ্যাঁড়াকলেই পড়লাম দেখছি,' মুসা বলল তিক্তকণ্ঠে। 'আমাদের দেখল নাকি!'

'হেলিকপ্টারের শব্দ নিশ্চয়ই শুনেছে,' কিশোর বলল। 'আমাদের নামতেও দেখতে পারে। না দেখলেও বুঝবে অশোক একা আসেনি।' মাথা ঝাঁকাল সে, 'কেবিনটাকে শুয়োরের খোঁয়াড় কারা বানাল এখন বোঝা যাচ্ছে।'

'কিন্তু দ্বীপে এল কিভাবে ওরা?' মুসার প্রশ্ন। 'সাঁতার কেটে নিশ্চয়ই নয়।'

'মিলারস টাউন থেকে মোটর বোটে করে এসেছে, এ তো সহজ কথা,' কিশোর বলল। 'হয়তো এখনও এখানেই আছে বোটটা। দ্বীপের কিনারে কোনও খাঁড়িতে লুকানো। ওপর থেকে দেখা যায় না।'

'আমার মনে হয় ওদের বিরুদ্ধে কিছু করার আগে বোটটা খুঁজে বের করা উচিত আমাদের,' মুসা বলল।

'পারলে তো ভালই হতো,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। 'কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে সম্ভব না। দ্বীপের কিনারগুলো মারাত্মক বিপজ্জনক। একবার চক্কর দিতেই আট-দশ মাইল হাঁটার ধাক্কা। তার ওপর টিলা-টক্কর। কুয়াশা না থাকলে এক কথা ছিল।'

'কি করতে বলো তাহলে?' মুসার প্রশ্ন।

'আটকে বসে থাকতে হবে। কুয়াশা না কাটলে আর কিছুই করা যাবে না।'

দরজার বাইরে খুট করে শব্দ হলো। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল সে। ঘরের সব ক'টা চোখ এখন দরজার দিকে।

খোলা দরজার বাইরে কুয়াশার দেয়ালে ছায়া পড়ল। একজন মানুষ। দেয়ালের এ পাশে বেরিয়ে এল সে। হাতে পিস্তল।

লোকটা অশোকের চেনা। তিন গোয়েন্দাকেও চিনিয়ে দিতে হলো না। অনুমানেই বুঝে গেল লোকটা কে। তার পেছনে আরও ছায়ার নড়াচড়া দেখা গেল।

ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। কেউ নড়ল না।

সাত

ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকল কারণ। 'তুমি এখানে,' অশোকের দিকে তাকিয়ে মসৃণ কণ্ঠে বলল সে। 'পালালে কেন? গালে লেগেছে বুঝি। দেখো তো কাণ্ড, মাথায়ও তো লাগতে পারত। আমার এই বন্ধুগুলো পিস্তল হাতে থাকলে পাগল হয়ে ওঠে, বড় বেশি তাড়াহুড়া শুরু করে। বাহ্, বহু লোকের সমাগম হয়েছে দেখছি।'

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। ঠোঁটের হাসিটা লেগেই রয়েছে। পেছনে ঢুকল তার দুই সহকারী। কুয়াশা ঢুকছে। একজন লাগিয়ে দিল দরজাটা।

'বোকামি করে না বসলে খারাপ কিছু ঘটবে না,' একে একে সবার দিকে তাকাল কারণ। অশোকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। 'শুধু শুধু দৌড় দিতে গেলে। তোমার গায়ে কখনও আঘাত করেছি আমি? তোমাকে আমি একেবারে নিজের ছেলের মতই দেখি।'

কারণের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। উস্কোখুস্কো চুলদাড়ি। মুখে হাসি লেগে থাকলেও চোখের দিকে তাকালেই কেঁপে ওঠে বুকের মধ্যে। সমস্ত নিষ্ঠুরতা যেন ওখানেই গিয়ে জড়ো হয়েছে। তার দুই সঙ্গীর দু'জনেই স্থানীয় লোক। চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায় দশ টাকার জন্যে নিজের মায়ের গলা কাটতেও পিছপা হবে না এরা। একজনের মাথায় জাহাজীদের টুপি।

'এখন বলে ফেলো তো, কোথায় রেখেছ ব্যাগটা?' অশোককে জিজ্ঞেস করল কারণ।

'কথা যদি বলতেই হয়, আমার সঙ্গে বলুন,' কিশোর বলল।

কারণের কালো চোখের তারায় আগুনের ঝিলিক দেখা গেল। 'এই, কে তুমি?'

'সেটা পরে জানতে পারবেন।'

'অশোক আমাদের লোক।'

'ছিল। এখন নেই।'

'দেখে তো বয়েস বেশি মনে হচ্ছে না। কিন্তু কথা বলছ যেন বুড়োর দাদা।'

'বয়েস কম হলেও অভিজ্ঞতা প্রচুর।'

ভ্রূকুটি করল কারুণ। 'নিজের চরকায় তেল দিলেই ভাল করবে, খোকা।'

'তাই তো দিচ্ছি।'

'কে বলল?'

'আমি।'

'নাম বলতে চাও না, তাই না? বেশ, বোলো না। তবে মালের ভাগ যদি চাওয়ার ইচ্ছে থাকে, মাথা থেকে দূর করে দাও ওসব দুশ্চিন্তা।'

'ভাগই হবে না, দুশ্চিন্তা করতে যাব কেন,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

তাকিয়ে রইল কারুণ। ছেলেটার দুঃসাহস অবাক করছে তাকে।

'তাকিয়ে তাকিয়ে শুনছ কি, বস,' ধৈর্য হারাল টুপি পরা লোকটা। ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'দাও না ফড়ফড়ানি বন্ধ করে। অকারণ সময় নষ্ট।'

'সময় এখনও বহুত নষ্ট হওয়া বাকি আছে আপনাদের,' জবাব দিল কিশোর।

কি যেন ভাবছে কারুণ। অশোকের দিকে তাকাল। 'তুমি কিছু বলবে না?'

'বলব। পুলিশকে সব জানিয়ে দিয়েছি কিনা, এ খবরটাই তো শুনতে চান?' ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করল অশোক।

রাগ দমন করতে পারল না আর কারুণ। ধরে রাখা হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেল মুখটা। ঝট করে পিস্তল উঁচু করল। ভয়ানক কণ্ঠে হিসিয়ে উঠল, 'নোংরা ইঁদুর কোথাকার···'

'ওকে গুলি করে, কিংবা গালি দিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না, মিস্টার কারুণ শিকদার,' বাধা দিল কিশোর। দুই নাবিকের দিকে তাকাল। 'আপনারা কেন এর দলে ভিড়েছেন, বুঝতে পারছি না আমি। স্পষ্ট কথা শুনে রাখুন, আমরা পুলিশের লোক। ভাল চাইলে যেখান থেকে এসেছেন, চলে যান। পরে নইলে এমন পস্তান পস্তাবেন, নিজের আঙুল নিজে কামড়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করবে।'

'মানে?' টেনেটুনে জামাটা ঠিক করল দ্বিতীয় নাবিক। 'তোমাদের দেখে তো ঠিক পুলিশ মনে হচ্ছে না। পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্যে আরেকটু বেশি বয়েস লাগে।'

'কেন, ভর্তি না হয়ে পুলিশকে সহায়তা করা যায় না?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'শুনুন, বাংলাদেশ আর ভারতের পুলিশ বিভাগ আপনাদের কথা সব জানে,' ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'মিয়ানমারের কোস্ট গার্ডকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবাই আপনাদের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। কারুণের সঙ্গে আপনাদের দেখা গেলে কেউ বাঁচতে পারবেন না। পালিয়ে পার পাবেন না। ও একটা খুনী। দু'জন লোককে ইতিমধ্যেই খুন করেছে। আপনাদেরকেও করবে না কি গ্যারান্টি আছে তার?'

'ও মিথ্যে কথা বলছে,' সিরিশ কাগজ ঘষার শব্দ বেরোল যেন কারুণের কণ্ঠ থেকে।

'মিথ্যে বলে লাভটা কি আমার?' শীতলকণ্ঠে প্রশ্ন করল কিশোর।

দ্বিধায় পড়ে গেছে দ্বিতীয় নাবিক। 'সত্যিই কি তোমরা পুলিশের সহকারী?'

'আমরা গোয়েন্দা। পুলিশের সহায়তায় এখানে এসেছি। লুটের মালের কথা সব জানে পুলিশ।'

'হুঁ। সেজন্যেই গলায় এত জোর। এই অশোক ছোকরাকে তোমরাই নিয়ে এসেছ?'

'উঁহুঁ। সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছে।'

'তারমানে মালগুলো কোথায় জানে সে?'

'এই দ্বীপেই আছে, এটা জানে।'

'ওর কথা শুনো না,' চেঁচিয়ে উঠল কারুণ। 'ও তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সে-ও সেই একই উদ্দেশ্যে এসেছে। অশোক ভাল করেই জানে মালগুলো কোথায়। তুমি এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ, তাই না, অশোক? আমাদের দেখাবে মালগুলো কোথায় রেখেছে। আমাদেরকে নিয়ে যাবে ওগুলোর কাছে।'

'ওকে নিয়ে যাওয়া আমরা ঠেকাতে পারব না,' কারুণকে বলল কিশোর। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে তার মাথায়। 'তবে জেনে রাখুন, ওর যদি একটা চুলও ছেঁড়ে, পুলিশ ছাড়বে না আপনাকে। আমিও ছাড়ব না। কুমেরু থেকে হলেও খুঁজে বের করে আনব আপনাকে।'

'বাপরে! তেজ কত!' দাঁত বের করে হাসল কারুণ। 'অশোক, এসো।'

অসহায় দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল অশোক।

'যাও তুমি,' এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, বুঝতে পারছে কিশোর। কথার জোরে কারুণকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভয় পাচ্ছে সে। 'তোমাকে কিছু করার সাহস পাবে না ওরা।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল অশোক। 'তুমি যখন বলছ।'

'তোমরা এখানে থাকো,' তিন গোয়েন্দাকে বলল কারূণ। 'খবরদার, বেরোনোর চেষ্টা করবে না কেউ। তোমাদের ওপর নজর রাখা হবে, এ কথাটাও মনে রেখো।'

চলে গেল কারূণরা তিনজন। সঙ্গে করে নিয়ে গেল অশোককে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবাক চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন আর মুসা। মুসা তো ক্ষোভের সঙ্গে বলেই ফেলল, 'এত সহজে যেতে দিলে? বাধা দেয়া যেত।'

'লাভ হতো না। ওদের হাতে পিস্তল। বেশি কিছু করতে গেলে গুলি করে বসত।'

'অশোককে সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন,' মুসা বলল, 'ঠিকই জিনিসগুলো উদ্ধার করে ফেলবে। পালিয়ে যেতেও অসুবিধে হবে না।'

'জিনিসগুলো এখন পাওয়া অশোকের জন্যেও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গর্তটা তো আর আগের মত নেই।'

'কোন্ জায়াগায় গর্তটা ছিল অশোককে বলতে বাধ্য করবে ওরা।'

'তারপর খোঁড়া শুরু করবে, এই তো?' কিশোর বলল। 'খুঁড়তে শাবল-কোদাল লাগে। পাবে কোথায়?'

'ধূর, এ সব তর্কাতর্কি ভাল্লাগছে না আমার,' হাত নাড়ল মুসা। 'আমার পেটে ছুঁচো নাচছে। খাবার দরকার। সেটা কোথা থেকে জোগাড় করা যাবে, বুঝে গেছি। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়।'

'কোথা থেকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বোটে করে এসেছে কারূণরা। কোথাও বাঁধা আছে সেটা। রাতে সেটাতেই ঘুমায় ওরা, সেজন্যেই এ কেবিনটা ব্যবহার করে না।'

'তাতে কি?'

'বোট আছে, তারমানে খাবারও আছে। গিয়ে নিয়ে এলেই পারি।'

'কে যাচ্ছে?'

'খিদেটা যেহেতু আমারই বেশি, আমিই যাব। বোটটা খুঁজে বের করব। কুয়াশা চোখ ঠেকাচ্ছে, নাক তো আর ঠেকাতে পারবে না। বহুদূর থেকে খাবারের গন্ধ পাব আমি।'

হেসে ফেলল রবিন। 'তা তুমি সত্যিই পাবে। কিন্তু আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ। কারূণ বলে গেছে, একজন গার্ড রেখে যাবে আমাদের পাহারা দেয়ার জন্যে। সেটার কি হবে?'

'ওসব ধাপ্পা। কে বসে থাকতে যাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে আমাদের দিকে নজর রেখে। ওই ভয়ে বসে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। না খেয়ে মরার চেয়ে বরং বুলেটকে বেছে নেব আমি।'

'বেশ, ধরা যাক, প্রহরীকে ফাঁকি তুমি দিয়েই ফেললে,' কিশোর

বলল। 'তারপরেও প্রশ্ন থাকে। এই কুয়াশার মধ্যে কতদূর হাঁটা লাগবে তোমার কে জানে।'

'হাঁটা লাগলে হাঁটব।'

'হেঁটে হেঁটে গিয়ে যদি দেখো বোট আগলে বসে আছে কারুণেরা, তখন কি করবে?'

'এত যদি যদি করলে খাবার পাওয়া যাবে না। তবে বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা এখন বোটের ত্রিসীমানায়ও নেই। খেপা কুত্তা যেমন খরগোশের পেছনে ছোটে, ওরাও তেমনি ধস নামা জায়গাটার দিকে ছুটেছে গুপ্তধনের লোভে।'

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। 'যা ভাল বোঝো করো। খাবারের জন্যে এতটা মরিয়া হয়ে গেলে ঠেকানো যায় না কাউকে।'

'আরও একটা কথা!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'আজ হলো কি আমার? বুদ্ধির পর বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে! সম্ভবত ওই কুয়াশা। এই আজব কুয়াশা মানুষের মগজকে উন্নত করে তোলে, বুদ্ধি বাড়িয়ে দেয়, আমিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।'

কৌতূহলী হলো কিশোর। 'এই নতুন বুদ্ধিটা আবার কিসের?'

'আমি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা হয়ে যাবে, সত্যিই কেউ পাহারা দিচ্ছে কিনা। পাহারা দিলে গুলি করে কিনা।'

'না দিলে?'

'বুঝবে এলাকা সাফ।'

'তাতে?'

'হলো কি তোমার আজ?' ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'কুয়াশা আমার মগজকে সাফ করল, আর তোমারটাকে কি ভোঁতা বানাল? শোনো, পাহারা না থাকলে রবিন কিংবা তুমি যে কোন একজন দৌড়ে চলে যেতে পারবে সেই ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডটাতে, যেখানে চৌহানের নামার কথা। কুয়াশা সরে গেলে ওখানে কারও না কারও অপেক্ষা করা উচিত।'

'একা কেন? দু'জনে একসঙ্গে গেলে ক্ষতি কি?' মুসার এই বুদ্ধিচর্চায় মজা পাচ্ছে মনে হলো কিশোর।

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা, 'তোমার বুদ্ধি আজ সত্যি সত্যি ঘোলা হয়ে গেছে। আরে বাবা, অশোক যদি কোনভাবে পালিয়ে আসে কারুণদের হাত থেকে, কেবিনে এসে কাউকে না দেখে, কি ভাববে? ভাববে, আমরা কেটে পড়েছি। ওর কথা বিন্দুমাত্র ভাবিনি। দিশেহারা হয়ে পড়বে না সে তখন?'

হাসি ছড়িয়ে গেল কিশোরের মুখে। 'তোমার মাথাটা আজ সত্যি পরিষ্কার হয়ে গেছে, মুসা। ঠিক আছে, যা করতে ইচ্ছে করছে,

করোগে। এখানে বসে বসে আঙুল চোষার চেয়ে কিছু একটা করাই বরং ভাল, যত বিপজ্জনকই হোক।'

'তাহলে যেতে বলছ? আমার কিন্তু হারানোর কিছু নেই।'

'আছে। পৈত্রিক প্রাণটা।'

'ওটা আমি হারাব না, ভরসা রাখতে পারো আমার ওপর। ফিরে আমি আসবই। এবং খাবার সহ।'

এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল মুসা। চুইয়ে ঢুকতে শুরু করল কুয়াশা। একটানে বাকিটা ফাঁক করেই হঠাৎ লাফ দিয়ে দরজার বাইরে পড়েই দৌড়।

'গেল!' হাহাকার করে উঠল রবিন, 'আজ ও আর বাঁচবে না! এখনই শুরু হবে গুলি!'

জবাব দিল না কিশোর।

কান পেতে আছে গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায়।

আট

বোটটা ঠিকই খুঁজে বের করল মুসা। এ ব্যাপারে দুটো জিনিস সাহায্য করল ওকে। প্রথমটা, কয়েক ঝলক দমকা বাতাস। দ্বিতীয়টা, দোয়া-দরূদ।

কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা নাক বরাবর হাঁটা দিয়েছিল সে। জানত, এ ভাবে হাঁটলে একটা না একটা সময় দ্বীপের কিনারে পৌঁছে যাবেই। কুয়াশার মধ্যে তীর দেখা না গেলেও ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শুনে বুঝতে পারবে তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে।

তীরের কাছে পৌঁছে পানিকে একপাশে রেখে হেঁটে এগিয়েছে সে। তাতে ভুল করে পাহাড়ের ওপর থেকে পানিতে পড়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

কেবিন থেকে বেরোনোর পর গুলির ভয় করেনি তেমন। কারণ, বুঝতে পেরেছিল, কোন কারণেই কারূণের কাছছাড়া হবে না তার দুই সহকারী। কে অকারণে কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে যাবে কেবিনের দরজার দিকে চোখ রেখে, যেখানে দরজাই দেখা যায় না কুয়াশার জন্যে। তা ছাড়া কারূণকে বিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই, সন্দেহের বীজটা ওদের মাথায় বেশ ভালমতই বপন করে দিয়েছে কিশোর। ওরা জেনে গেছে, জিনিসগুলোর জন্যে ইতিপূর্বে দু'-দুটো খুন করেছে

কারণ। অতএব আগে করলেও এখন আর তাকে বিশ্বাস করবে না ওরা। ভাববে, জিনিসগুলো পেয়ে গেলেই ফাঁকি দিয়ে পালাবে। সুতরাং কাছে কাছে থাকতে চাইবে।

সাগরের দিক থেকে আসা কয়েক ঝলক দমকা বাতাস কুয়াশা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বেশ কিছুটা। প্রথম দিকে পাঁচ গজের বেশি দেখা যাচ্ছিল না। বাড়তে বাড়তে সেটা একশো গজে এসে ঠেকেছে এখন।

মিনিট পঁচিশেক হাঁটার পর কানে এল গান। শব্দ লক্ষ্য করে এগোল সে। দূর থেকে গান মনে হলেও কাছে আসার পর বুঝল সুর করে আরবীতে দোয়া-দরূদ পড়ছে কেউ। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যেতেই প্রায় শ'খানেক ফুট নিচে খাঁড়িতে ভাসমান বোটটা চোখে পড়ল। বোটের ডেকে দাঁড়ানো একজন টুপি পরা মানুষ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো জোরাল কণ্ঠে দোয়া পড়ে পড়ে যেন ভয় তাড়াচ্ছে।

হাসি ফুটল মুসার মুখে। যাক, পাওয়া গেল বোটটা। তবে তাতে মানুষ দেখে দমেও গেল। নিশ্চয় পাহারা দিচ্ছে লোকটা। ওকে সরাতে না পারলে খাবার চুরি করতে পারবে না। কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল লোকটা। চমকে গেল। 'কনে রে! ও মিয়া, আমনে কন? ভূত নি কুনো?' তাড়াতাড়ি দোয়া পড়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে শুরু করল বুকে। 'ও মা গো! আগেই বুইজ্‌জিলাম, এমন জাগার জাগা, ভূত ন থাই হারে না।'

কাছে যেতে যেতে অভয় দিল মুসা, 'না না, আমি ভূত না। মানুষ। চিনতে পারছেন না?'

'তাইলে বাই আমনে এত কালা কা? ভূতেরা কত রূপ ধরি আইয়ে। ঠিক ঠিক মানুষ ত?'

ভাষা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। কোথায় শুনেছে এ রকম বাংলা উচ্চারণ আর টান মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ল, নোয়াখালি। বাংলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি মানুষই। আপনার কোন ভয় নেই।'

বোটের কাছে এসে দাঁড়াল সে। কাছে থেকে দেখল লোকটাকে। ছোটখাট মানুষ। টুপিটা মাথার ঠিক পেছনটায় আলতো করে বসিয়ে দিয়েছে। মাথার সামান্যই ঢাকা পড়েছে তাতে। চুল খুবই পাতলা লোকটার। ভুরু বলতে নেই, চাঁছাছোলা। চোখে পাপড়িও যে ক'খানা আছে, গোণা যায়। থুতনির কাছে অল্প কিছু দাড়ি। ঘনঘন দু'তিন বার আঙুল চালাল সেগুলোতে। 'ত, আমনে কইত্তুন আইছেন, বাই? আম্‌গো মালিকের খবর কি?'

'আপনাদের মালিক?'

'হেতেনে ত কারূণ সাআবের লগেই গেছে।'

'কোনজন? টুপি পরা, না টুপি ছাড়া?'

'টুফি ফরা। হেতেনেই ত এই জাআজের ক্যাপ্টিন।'

'নাম কি?'

'অ, নামঅ জানেন না। হারিঙ্গা। হারিঙ্গা সাআব।'

'মানে ফারিঙ্গা সাব?'

'হ।'

'এই বোটের মালিকও কি তিনি?'

'হ। ত আমনে কিয়া চান?'

'কারূণ সাহেব আর আপনার মালিকের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছি আমি। আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন। তীর ধরে মাইল দুয়েক গেলেই পেয়ে যাবেন তাদের,' হাত তুলে দেখাল মুসা।

'কিয়ের লাই?'

'একটা শাবল-টাবল নিয়ে যেতে বলেছেন। মাটি খোঁড়ার জন্যে। আছে না বোটে?'

'শাবল যে জাআজে নাই, হেইডা হারিঙ্গা সাআবে জানে না? আর্চইয্য কতা! কোদাইল আছে। অইব নি?'

'কোদাল? হবে হবে। মাটি কাটার জন্যে বরং ভালই হবে। আপনি ছাড়া আর কে আছে এই বোটে?'

'না, আর কেঅ নাই। একলা একলা থাই খোদারে ডাইক্‌তে আছিলাম। সব সময় দোয়া-দরূদ হড়ন বালা।'

'বোটে কি কাজ করেন?'

'রান্দনের কাম।'

'আপনি বাবুর্চি?'

'হ।'

'তাড়াতাড়ি চলে যান। ততক্ষণ আমি বোট পাহারা দিই।'

বোটে উঠল মুসা। কোদাল আনতে ভেতরে চলে গেল লোকটা। খানিক পরে বেরিয়ে এল কোদাল হাতে। জিজ্ঞেস করল, 'আমনের নাম কিয়া, বাই?'

'মুসা আমান। আপনার?'

'লাতু মিয়া। আমনের নাম হুনি ত মুসলমানই মনে অয়। আসলে মুসলমান নি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি কন্ দেশে?'

'আমেরিকা।'

'বাউরে! আমেরিকাতঅ মুসলমান আছে। দেইক্ছেন নি আল্লার কুদরত। হক্কল দেশে মুসলমান রাখি দিছে। আল্লা আল্লা। আল্লায় ইচ্ছা কইর্লে কিয়া ন কইত্ত হারে। আইচ্ছা বাই, আমনে থাকেন। আমি যাইমু আর আইমু। রান্দুনি গরে চাঁ-ফাতা আছে। বানাই খাইয়েন। বিস্কুটঅ আছে। চাঁ দি বিজাই খাইয়েন।'

কোদাল হাতে তাড়াহুড়া করে নেমে চলে গেল লোকটা। সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মুসা। তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে লাতু মিয়া। বড়ই সহজ-সরল। মিথ্যে কথা বলে ওকে ঠকিয়েছে বলে খারাপই লাগল তার।

লোকটা কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতেই রান্নাঘরে ঢুকল মুসা। প্রচুর খাবার দেখতে পেল। মোটা একটা কাপড়ের ব্যাগ বের করে তাতে ঠেসে ভরতে লাগল যতটা পারা যায়। ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে আসতে যাবে, হঠাৎ মাথায় এল বুদ্ধিটা। নাহ্, আজ সত্যিই মগজ খুলে গেছে তার। একের পর এক বুদ্ধি বেরোচ্ছেই শুধু।

বোটটা ধ্বংস করে দিয়ে যেতে হবে! গুপ্তধন খুঁজে পেলেও পালাতে পারবে না তাহলে আর কারুণের দল। দ্বীপে আটকা পড়বে। হয়তো কেবিনে গিয়ে হামলা চালাবে তখন। সেটা পরের কথা। যখন করে তখন দেখা যাবে।

খাবারের ব্যাগটা প্রথমে তীরে নামিয়ে রেখে এল সে। পেট্রলের ড্রাম থেকে পেট্রল বের করে বোটের ডেকে ঢালতে শুরু করল। কেবিনে ঢুকল কিছু কাপড় নিয়ে আসার জন্যে। কাপড় খুঁজতে গিয়েই পেয়ে গেল পিস্তলটা। একবার দ্বিধা করে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। কাপড়গুলো নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ডেকে ঢালা পেট্রলের ওপর ছড়িয়ে ফেলল ওগুলো। পেট্রল শুষে নিতে লাগল কাপড়। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাপড়ের পলিতা বানিয়ে একমাথা রাখল ডেকে, অন্য মাথা ঢোকাল পেট্রলের ড্রামে। রান্নাঘর থেকে দিয়াশলাই বের করে এনে কাঠি ধরিয়ে ছুঁড়ে মারল পেট্রলে ভেজা কাপড়ের ওপর। একটা মুহূর্তও দেরি না করে প্রায় ডাইভ দিয়ে নেমে এল মাটিতে। তীরে নেমেই একটানে খাবারের ব্যাগটা তুলে কাঁধে ফেলে দিল দৌড়।

আগুন ধরে গেছে কাপড়ে। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পেট্রলের ড্রামে আগুন পৌঁছুতে দেরি হবে না। চোখের পলকে গ্রাস করে নেবে পুরো বোটটাকে।

ওপরে উঠে এল মুসা। ফিরে তাকাল একবার। ক্রমেই ছড়াচ্ছে বোটের আগুন। দমকল বাহিনীও আর এখন বাঁচাতে পারবে না ওটাকে। সন্তুষ্ট চিত্তে কেবিনের দিকে হাঁটা দিল সে।

দমকা বাতাসে সামান্য সময়ের জন্যে কুয়াশা কিছুটা পাতলা হলেও আবার ঘন হতে শুরু করেছে। পাঁচ-সাত গজের বেশি আর দৃষ্টি চলছে না এখন। অর্ধেক পথও পেরোয়নি, সামনে থেকে শোনা গেল মানুষের গলা। চট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মুসা।

সামনে দিয়ে দ্রুত চলে যেতে দেখল কারণের দলটাকে। রীতিমত আতঙ্কিত মনে হচ্ছে। লাতু মিয়া আছে ওদের সঙ্গে। হাতের কোদালটা নেই। ও নিশ্চয় গিয়ে মুসার কথা বলেছে সব। ভয় পেয়ে গিয়ে বোটে কি ঘটছে দেখার জন্যে দৌড় দিয়েছে কারণ আর তার দলবল। অশোক ওদের সঙ্গে না থাকলে খুশি হতো মুসা। কিন্তু সবকিছু তো আর তার ইচ্ছেমত চলবে না।

কুয়াশার মধ্যে দলটা অদৃশ্য হয়ে গেলে আবার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিজের পথে চলল মুসা। খানিক পরে আবার কথা শোনা গেল পেছনে। দৌড়ে আসছে লোকগুলো। কারণের দল। বোটটাকে পুড়তে দেখে নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। ওকে ধরতে এখন কেবিনের দিকে ছুটেছে।

কাঁধে বিরাট বোঝা। কুয়াশার মধ্যে অজানা পথে চলাও কঠিন। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে বিপদ আরও বেড়ে যেতে পারে ভেবে আবার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মুসা। কুয়াশায় ভেজা গাছের পাতা ভিজিয়ে দিল সারা শরীর। অস্বস্তিকর অবস্থা। কিন্তু কিছু করার নেই।

সামনে দিয়ে আবার চলে যেতে দেখল তিনজন লোককে। কারণ আর তার দুই দোস্তের হাতে পিস্তল। ভয়ঙ্কর হয়ে আছে চেহারা। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। কিন্তু এত তাড়াহুড়া করে কোথায় চলেছে সেটা অনুমান করা কঠিন। বোট পোড়ানোটা কি ঠিক হলো? ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল আরেকটা কারণে। অশোক কিংবা লাতু মিয়া নেই এখন ওদের সঙ্গে। অশোককে খুন করে ফেলল না তো? দুটো করেছে, আরও একটা খুন করতে হাত কাঁপবে না কারণের মত খুনীর।

ব্যাগটা নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরোল সে। কাঁধে ফেলে এগিয়ে চলল সাবধানে। শত্রুরা সামনেই কোনখানে রয়েছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। গেল কোথায়? বনের মধ্যে যাবে না। যাওয়ার কোন কারণ নেই। হেলিকপ্টারটা এলে সেটাকে কব্জা করার বুদ্ধি যদি এঁটে থাকে, লাভ হবে না। কুয়াশা এখনও এত বেশি, আসতে পারবে না চৌহান।

বাকি রইল দুটো সম্ভাবনা। দুই জায়গায় যেতে পারে ডাকাতগুলো। এক, কেবিনে। দুই, ধস নামা জায়গাটায়, গুপ্তধন খুঁজতে। কোদালটা নিশ্চয় ওখানেই ফেলে এসেছে লাতু মিয়া।

ভাবতে ভাবতে কেবিনের একশো গজের মধ্যে চলে এল মুসা। নতুন একটা ভাবনা উদয় হলো মনে। কারণের দলটা যদি ওখানেই থেকে থাকে, তার কেবিনে প্রবেশ এখন চূড়ান্ত বিপদের কারণ ঘটাতে পারে। তাকে দেখে রেগে গিয়ে কি করে বসবে কারণ, বলা যায় না। খাবারের ব্যাগটাকে এখন একটা বিরক্তিকর বোঝা মনে হচ্ছে তার কাছে। একবার ভাবল ফেলে দেয়। কিন্তু ফেলে দিলে আর খাবার জোগাড় করতে পারবে না। ফারিঙ্গার বোটটা এখন পানির তলায়। অবশিষ্ট পোড়া খাবারও সেখানে।

কিন্তু কিছু একটা করা দরকার। ব্যাগটা রেখে যেতে পারে। মাটিতে রেখে গেলে শিয়ালে খাবে। বড় একটা গাছের ডালে ঝোলাল ব্যাগটা। পা বাড়াল আবার।

হঠাৎ হিসহিসানী শোনা গেল। চমকে গেল মুসা। থমকে দাঁড়াল। কিসের শব্দ? শিয়ালে তো এমন শব্দ করে না। সাপ হতে পারে। ভয়ানক রাজগোখরো। মারাত্মক বিষাক্ত। আন্দামানের আতঙ্ক। প্রতি বছর গাছ কাটতে জঙ্গলে ঢুকে কত মানুষ যে এই সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। পকেট থেকে পিস্তল বের করল সে। মাটিতে খুঁজতে লাগল সাপটাকে।

কাছেই একটা ঝোপের ডাল নড়ে উঠতে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল সেদিকে। সাপ নয়। ডাল সরিয়ে আস্তে করে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। লম্বা। রোগা-পাতলা। চুল-দাড়িতে ভর্তি। মাথায় বাঁধা এক টুকরো রক্তমাখা ছেঁড়া নেকড়া। নোংরা কাপড়ে-চোপড়ে আস্ত একটা পাগল মনে হচ্ছে লোকটাকে।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা।

আস্তে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল লোকটা। তারপর বলল, 'রবিন তোমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছে।'

আরও অবাক হয়ে গেল মুসা। বলে কি লোকটা! কে সে? রবিনের সঙ্গেই বা পরিচয় হলো কিভাবে?

নয়

মুসা কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কিশোর আর রবিন। গুলির শব্দের অপেক্ষা করতে লাগল। দুই মিনিট কেটে যাবার পরেও যখন শোনা গেল না শব্দ, ধীরে

ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল দু'জনে।

'ও চলে গেছে,' খুব নিচুস্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল রবিন। 'পার হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হুঁ। মিছে কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়ে রেখে গেছিল কারণ। কিন্তু এই কুয়াশার মধ্যে কতখানি কি করতে পারবে মুসা, জানি না। দেখা যাক।'

আবার নীরবতা। চুপচাপ কাটতে লাগল সময়। এক ঘণ্টা হয়ে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। উঠে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে এল রবিন। কুয়াশা সামান্য পাতলা হয়েছে বলে মনে হলো তার।

'তাতেই বা কি,' শুনে জবাব দিল কিশোর। 'এখান থেকে এখন কোনমতেই বেরোতে পারছি না আর আমরা। প্রথমে ছিল অশোক, এখন মুসা—ওদের ফেরার অপেক্ষা করতেই হবে। ফিরে এসে আমাদের কাউকে না দেখলে মহা সমস্যায় পড়ে যাবে।'

'মেসেজ লিখে রেখে যেতে পারি আমরা।'

'কি লিখে যাব? কি করব তা-ই তো জানি না। বাইরে বেরোলে এখন যা খুশি ঘটে যেতে পারে। কারণও ফিরে আসতে পারে। মেসেজের লেখা দেখে তখন জেনে যাবে কোন্‌দিকে গেছি আমরা। উঁহুঁ, তোমার বুদ্ধিটা আমার তেমন পছন্দ হলো না।'

আরও সময় কাটল। আবার গিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা দেখে এল রবিন। 'কুয়াশা সত্যিই পাতলা হয়েছে,' জানাল সে। 'শুধু শুধু কেন এখানে বসে থাকব বুঝতে পারছি না।'

'কেন বেরোব, সেটাও বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর।

'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের দিকে গিয়ে দেখা যেতে পারে। হঠাৎ করে যেমন শুরু হয়েছে, হঠাৎ করেই তেমনি শেষ হয়ে যেতে পারে কুয়াশা। আসতে দেরি করবে না তখন চৌহান। ওত পেতে থাকতে পারে কারণের দল। চৌহানকে বেকায়দা অবস্থায় ফেলে কপ্টারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিংবা ধ্বংস করে দিতে পারে। তখন কি করব?'

'তুমি কি করতে বলো?'

'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডটা খুঁজে বের করতে পারব আমি। একজনের গিয়ে ওখানে বসে থাকা উচিত আমাদের। চৌহান না এলে ফিরে আসব। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'ঘরে থাকতে না ইচ্ছে করলে যাও। তবে লাভটাভ বিশেষ হবে বলে মনে হয় না। সাবধানে থেকো। কোন অবস্থাতেই কারণের সামনে যাতে না পড়ো।'

'না, পড়ব না।'

'আমি এখানেই থাকব।'

'আচ্ছা। কুয়াশা থাকুক বা না থাকুক, রাত নামা শুরু হলেই ফিরে আসব আমি। আলো থাকতে থাকতে না এলে এ রকম আবহাওয়ায় রাতে আর আসবে না চৌহান।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। পাল্লা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল। তারপর বেরিয়ে গেল। দরজাটা নিঃশব্দে লাগিয়ে দিল পেছনে।

একা বসে বসে ভাবতে লাগল কিশোর। একবারই মাত্র নড়ল সে, আগুনটা উসকে দেয়ার জন্যে। ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটে যাচ্ছে, মোটেও ভাল লাগছে না তার। কারুণের দ্বীপে ফিরে আসাটাই গোলমাল করে দিয়েছে সব। এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল আগেই। ওর কথাটা হিসেবের মধ্যে না রাখাতেই এখন যত বিপত্তি।

মুসা কিংবা রবিনকে নিয়ে ভাবছে না বিশেষ। নিজেদের বাঁচানোর ক্ষমতা আছে ওদের। কিন্তু অশোকের ব্যাপারটাই চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। যে কোন সময় ওকে খুন করে বসতে পারে কারুণ। একেবারেই বাধাটাধা না দিয়ে ওকে এ ভাবে কারুণের হাতে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি মোটেও।

কেবিনের একমাত্র জানালাটার আলো ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। কমে যাচ্ছে দিনের আলো। এগিয়ে আসছে রাত। মুসা আর রবিনের ফেরার সময় হয়েছে।

বাইরে টিনে লাথি লাগার শব্দ হলো। কে? মুসা বা রবিন এতটা অসাবধান হবে না। যদি তাড়াহুড়া কিংবা খারাপ খবর না থাকে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। উদ্যত পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকল কারুণ। পেছনে তার দুই সহকারী।

'কোথায় ও?' পিস্তল নাচিয়ে গর্জে উঠল কারুণ।

নড়ল না কিশোর। 'কে?'

'কালোমুখো ওই নিগ্রো ছোঁড়াটা,' ভয়ঙ্কর স্বরে বলল জাহাজীদের টুপি পরা লোকটা।

'কেন, কি করেছে ও?' নিরীহ মুখভঙ্গি করে থাকল কিশোর।

'কি করেছে! আমার জাহাজটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে! শয়তান ছোঁড়া কোথাকার!'

কষ্টে হাসি চাপল কিশোর। এই কাণ্ড করেছে তাহলে মুসা। সেজন্যেই আসতে দেরি করছে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না এমন ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর, 'কিসের বোট? জানতামই না আপনারা বোট নিয়ে এসেছেন।'

'এলাম কিভাবে তাহলে?'

'সেটা আমি কি করে জানব, বলুন? আমি তো আর গণক নই।'

'কোথায় ও?' চিৎকার করে উঠল লোকটা।

'এখানে নেই। আমি ভাবছিলাম আপনাদের সঙ্গে বুঝি দেখা হয়েছে ওর। এখানে লুকিয়ে থাকার যে জায়গা নেই, দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল লোকগুলো। কিশোরের গোবেচারা ভঙ্গি দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে ওদের।

'অশোককে কি করেছেন আপনারা?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ও ভাল আছে,' কঠিন স্বরে জবাব দিল কারুণ।

'থাকলে আপনাদেরও ভাল।'

'আমাদের ভালমন্দের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'দরজাটা লাগিয়ে দিন না। অহেতুক কুয়াশা ঢোকাচ্ছেন।'

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল কারুণ।

'থ্যাংক ইউ,' বিনয়ের অবতার বনে গেল যেন কিশোর। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন?'

'আমার বোটের কি হবে?' খড়খড় করে উঠল টুপিপরা লোকটা।

'তার আমি কি জানি? আপনার বোটের দায়িত্ব কি আর আমার ওপর ছিল। আরেকটা জোগাড় করে নেবেন।'

'টাকাটা কে দেবে, শুনি?'

'আমি অন্তত দিতে পারব না। এত টাকা সাথে করে নিয়ে আসিনি। অ, আপনাদের বোধহয় একটা কথা জানা নেই, এ দ্বীপটার একজন মালিক আছে। তার বিনা অনুমতিতে এসে থাকলে বেআইনী কাজ করেছেন।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' দাঁত বের করে হিসিয়ে উঠল কারুণ।

'ভাবতে হবে। কারণ যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হতে পারে পুলিশ,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'তাদের কাছে দ্বীপে নামার কৈফিয়ত দিতে হতে পারে আপনাদের।'

'আমরা কি করব না করব সেটা কি তোমার কাছ থেকে শুনতে হবে নাকি?'

'উঁহুঁ, তা হবে না। তবে আপনাদের ভবিষ্যৎটা দেখতে পাচ্ছি তো আমি, তাই বললাম। সময় থাকতে কেটে পড়ার চেষ্টা করুন। যাকগে, বহুত প্যাঁচাল হয়েছে। এ সব ফালতু কথা আর ভাল্লাগছে না আমার।'

টুপিওয়ালার সঙ্গী অন্য স্থানীয় লোকটা বলল, 'বোট ছাড়া কেটে পড়ব কিভাবে?'

'সেটা আপনাদের ভাবনা,' কিশোর বলল। 'আমার পরামর্শ দেয়া দরকার, দিলাম। তবে পুলিশ আপনাকে তীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। কিন্তু তাহলে তো তীরে নেমে শ্রীঘরেও নিয়ে যেতে চাইবে আপনাদের। ভেবে দেখুন আমার কথাটা।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল আবার তিনজনে।

মুখটাকে যতই স্বাভাবিক করে রাখুক, মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে কিশোর। যে কোন মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারে মুসা। ওকে দেখলে রাগ চরমে উঠবে কারুণের। গুলি করে বসাটা অসম্ভব নয়।

কি যেন ভাবছে কারুণ। আচমকা ঘোষণা করে বসল, 'আমরা এখানেই রাত কাটাব।'

থাকতে চাইবেই সে। জানা কথা। বোট নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে এই কুয়াশার মধ্যে বাইরে রাত কাটাতে যাবেই বা কেন? আশঙ্কাটা বাড়তে থাকল কিশোরের। মুসাও বাইরে থাকবে না। কেবিনে ফিরবেই। আসল অঘটনটা ঘটে যাবে তখন।

'আপনাদের স্বাগত জানাতে পারব না আমি, দুঃখিত,' জবাব দিল কিশোর। 'তা ছাড়া এখানে আরামও পাবেন না। খাবার-টাবার কিচ্ছু নেই। আগেই তো সব শেষ করে দিয়ে গেছেন।'

'কে শেষ করেছে!' অবাক হলো কারুণ। 'কেবিনে ঢুকেছি, কিন্তু এখানকার খাবার ছুঁয়েও দেখিনি আমরা। নিজেরাই প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছি।'

সত্যিকারের অবাক হলো এতক্ষণে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'খাবারগুলো তাহলে কে শেষ করল? বাইরে খালি টিনগুলোই বা ছড়িয়ে রাখল কে?'

'খাবার শেষ কে করল, আমি কি করে বলব। বাইরে টিনগুলো আমরাই ফেলেছি। কিন্তু কেবিনের খাবারের টিন নয়। আসার সময় বোট থেকে নিয়ে আসতাম।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না আর। পিস্তলটা পকেটে ভরতে ভরতে কারুণ বলল, 'খবরদার, কোন রকম শয়তানি করার চেষ্টা করবে না।'

'পাগল! তাহলে তো দেবেন বাইরে বের করে, তা কি আর জানি না। এই কুয়াশার মধ্যে বাইরে রাত কাটানোর কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

দরজার দিকে চোখ পড়তে মুখের পেশি শক্ত হয়ে গেল কিশোরের। পাল্লাটা ফাঁক হচ্ছে। এক ইঞ্চি। আরও এক ইঞ্চি।

কে এল? মুসা, না রবিন?

দম বন্ধ করে ফেলল সে।

দশ

ঠিকমতই ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে পৌঁছেছে রবিন। খুব একটা কঠিন হয়নি আসাটা। তার কারণ, হেলিকপ্টারটা নেমেছিল দ্বীপের নিচু অঞ্চলে। কেবিনটা উঁচু জায়গায়। ওটা থেকে বেরিয়ে দ্বীপের ভেতরের দিকের ঢালটা খুঁজে নিতে যেটুকু সময়, তারপর সোজা হাঁটা দিয়েছে সে। তরতর করে নেমে চলে এসেছে নিচে।

কুয়াশার মধ্যে একটা পাথরের ওপর বসে আছে, হাত পড়ল কাঁধে। ভীষণ চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'কে?'

হতবাক হয়ে গেল লোকটাকে দেখে। পাগল-টাগল নাকি! মাথায় বাড়ি মারার জন্যে একটা লাঠি উঁচু করে রেখেছে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'সেটা জেনে আপনার লাভ?' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল রবিন। সে ভাবল লোকটা কারণের দলের।

'এখানে কি করছ?'

'যা করছি করছি, আপনার কি?'

'আমার কি মানে? আমি দ্বীপটার মালিক।'

দ্বিতীয়বার চমকানোর পালা রবিনের। 'আপনার মানে...' চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। 'আপনি...'

'মুনিআপ্পা।'

'রজন মুনিআপ্পা?'

'হ্যাঁ।'

'বলেন কি!' কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে গেল রবিনের। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি...আমি তো অবাক হচ্ছিলাম এই রবিনসন ক্রুসোটা কে ভেবে!'

'ক্রুসোই হয়ে গেছি আমি এখন।'

'বেশ, আমি তাহলে আপনার সহকারী ফ্রাইডে। শুধু একজন না, আরও তিন-তিনজন সহকারী পাবেন আপনাকে সহায়তা করার জন্যে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল।

'কয়েকটা লুটেরা ডাকাত আমার দ্বীপটাকে দখল করে বসেছে।'

'জানি।'

'জানো!'

'সব জানি। কিন্তু আমরা জানতাম আপনি মারা গেছেন।'

'আরেকটু হলেই যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভাল, তাই মরতে মরতে বেঁচেছি। কারুণ নামে নরকের শয়তানটা আমাকে খুন করে ফেলেছিল আরেকটু হলেই।'

'ওর কাজই মানুষ খুন করা।'

'চেনো ওকে?'

'চিনি। লাঠিটা নামানো যায় না এবার?'

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, তা যায়,' লাঠিটা নামাল রজন। 'আমি তোমাকে কারুণের লোক ভেবেছিলাম। ওর লোক হলে মাথা না ফাটিয়ে ছাড়তাম না আজ। ও একটা খটাশ। ছুঁচো। পেছন থেকে মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে আমার বোট থেকেই আমাকে সাগরে ফেলে দেয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল বলেই বোধহয় ধাক্কা দিয়ে পানি হুঁশটা ফিরিয়ে এনেছিল আমার। সাঁতরে এসে তীরে উঠলাম। আমাকে দেখে ফেলেছিল কারুণ। গুলিও করেছিল। দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।'

'তারপর থেকেই আছেন এখানে?'

'যাব কি করে? আমার বোটটা খাঁড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল কারুণ। কিন্তু গুলি খাওয়ার ভয়ে আর ওদিক মাড়াইনি।'

'খাবার পেলেন কোথায়?'

'কেবিনে যা ছিল, সেগুলো। আর শিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢেউয়ে এসে আটকে পড়া শামুক-গুগলি-ঝিনুক এ সব খেয়ে পেট ভরিয়েছি। কারুণ কি যেন খোঁজাখুঁজি করছিল দ্বীপে। ওই সুযোগে কেবিন থেকে গিয়ে খাবার নিয়ে এসেছি। কিন্তু কদ্দিন আর চলে। দেখছ না, না খেতে পেয়ে কি অবস্থা হয়েছে আমার।'

'কিন্তু আপনিই তো কারুণকে কেবিন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ দ্বীপে ফিরলেন কেন আবার?'

'ও আমাকে আসার জন্যে এমন পীড়াপীড়ি শুরু করল, না এসে পারিনি। জন্মদিনে উপহার পাওয়া একটা সোনার ঘড়ি ফেলে গেছে। ঘড়িটা নাকি দিয়েছিল তার স্বর্গবাসিনী মা। এমন কাকুতি-মিনতি করে বলল, মন গলিয়ে দিয়েছিল আমার।'

'আর আপনি তাকে বিশ্বাস করলেন!'

'না করার কোন কারণ ছিল না তখন।'

আবার কথা বলার আগে একটা মুহূর্ত বিরতি দিল রবিন। তারপর ধীরে সুস্থে জানাল, 'অলঙ্কারের দোকান থেকে বিশ কোটি টাকার মাল

লুট করে এখানে এসে উঠেছিল সে। এই দ্বীপেই কোনও একটা শিয়ালের গর্তে লুকানো হয়েছে সেগুলো।'

হাঁ হয়ে গেল রজন। 'এই তাহলে ব্যাপার! মিথ্যুক কোথাকার। এতক্ষণে সব প্রশ্নের জবাব পেলাম। জিনিসগুলো এখনও গর্তের মধ্যেই আছে?'

'যতদূর জানি আমরা, আছে।'

'আমরা মানে কে কে?'

'মুরিয়া চৌহান, অশোক আর আমরা তিন বন্ধু। আমার সঙ্গে তারাও এসেছে।'

'অশোক! কোন অশোক?'

'আপনি যাকে চেনেন।'

'ওই ছেলেটা সত্যিই ভাল। আমার অবাক লাগছিল, হঠাৎ করে আমার বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল কেন সে, পালাল কেন।'

'আপনার ভয়ে পালায়নি। কারুণের কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিল। ওর ভয় ছিল, কারুণ ওকে খুন করে ফেলবে।'

'খুন! কেন?'

'কারণ জিনিসগুলো সে-ই লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। আমাদেরকে সব কথা বলেছে। সাহায্য চেয়েছে। মালিকের পক্ষ থেকে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। কিন্তু আমরা এখানে আসার একটু পরেই কারুণ আর তার চ্যালারা অশোককে ধরে নিয়ে গেছে।'

'তাই নাকি! কারুণ তাহলে এখানেই। দারুণ খবর শোনালে।'

রবিনের পাশে আরেকটা পাথরে বসে পড়ল রজন। 'তোমার বন্ধুরা এখন কোথায়?'

'একজন কেবিনে। তার নাম কিশোর পাশা। আরেকজন মুসা আমান, খাবার আনতে কারুণদের বোটে গিয়েছিল। আমি বেরোনোর আগে পর্যন্ত ফেরেনি। আর আমার নাম রবিন মিলফোর্ড।'

রবিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রজন। 'তোমার বন্ধু খাবার আনতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'কেন?'

'বোট পাহারার জন্যে একজন লোক আছে।'

'যতই থাকুক, খাবার ছাড়া ফেরত আসবে না মুসা।'

'তুমি কি করবে?'

মুরিয়া চৌহান আসতে পারে, জানাল রবিন। 'কন্টারটার জন্যে অপেক্ষা করব। না এলে কেবিনে ফিরে যাব।' রজনের দিকে তাকাল সে। 'আপনার কথা বলুন। কারুণ আর অশোককে দ্বীপ থেকে উদ্ধার

করে নিয়ে যাবার পরে কি কি ঘটল।'

'অশোকের কাছ থেকে সব শুনেছ, বলার আর তেমন কিছুই নেই,' রজন বলল। 'নিয়ে গিয়ে ওকে আর কারুণকে আমার বাড়িতে তুললাম। এক রাত থাকার পরই পালিয়ে গেল অশোক। এখন বুঝতে পারছি, ও চলে যাওয়াতে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল কেন কারুণ। দিন দু'য়েক ওকে খুঁজে বেড়াল সে। আমার তখন ব্যবসার কাজে বাইরে যাওয়াটা জরুরী ছিল। ওকে গিয়ে কৃষ্ণ রারাতুঙ্গার বোর্ডিং হাউসে থাকতে বললাম। ও বলল ওর কাছে এক কানাকড়িও নেই। তাকে কিছু টাকা দিলাম। চলে গেল সে। ভোররাতে ফিরে এসে বলল সোনার ঘড়িটার কথা। ভাবলাম, যেতে-আসতে আর কতক্ষণই বা লাগবে। এতটাই যখন করলাম, বাকিটুকুও করে দিই। ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়লাম আমার বোটে করে ওকে নিয়ে।'

'হুঁ, এখন বুঝলাম,' মাথা দোলাল রবিন। 'এ কারণেই মানিয়াফুরার কেউ কিছু জানে না আপনাদের এ সব কথা।'

'মনে হয়। কাউকে বলে আসার কথা ভাবিইনি। কেউ দেখেওনি আমাদের।'

'তারমানে আপনাকে মেরে ফেলার ফন্দি করেই বেরিয়েছিল কারুণ।'

'তাই তো। দ্বীপে আসার প্রয়োজন ছিল তার, থাকার প্রয়োজন ছিল, বোট ছাড়া হবে না, তাই আমারটা দখল করার মতলব করেছিল।'

'তারপর নিশ্চয় গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে চলে গিয়েছিল। মানিয়াফুরায় থেকেছে কিছুদিন। ওখানে সুবিধে করতে না পেরে মিলারস টাউনে চলে গেছে। সেখান থেকে ওর মত কিছু লোক জোগাড় করে ফিরে এসেছে ভালমত খোঁজার জন্যে।'

'তা-ই হবে। ওকে যেতে দেখিনি আমি। বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। অসুস্থ অবস্থায়। কারণ মাথার আঘাতটা হজম করা সহজ ছিল না। আমার বোটটা কোথায় রেখেছে ও, জানতাম না। আর জানলেও বেরোতাম না। ওটা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি করে মারত আমাকে। তারপর সে চলে গেল। ফিরে এল আরেকটা মোটর বোট আর লোকজন নিয়ে। আমার বোটটা কি করেছে জানি না।'

'সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। কারণ মানিয়াফুরায় ওটা নিয়ে গেলেই লোকের কাছে কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজন পড়বে। মেইনল্যান্ডের কোন নির্জন জায়গায় নেমে আপনার বোটটা সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। চালক না থাকায় ডুবো পাথরে বাড়ি খেয়ে কিংবা স্রোতের মধ্যে পড়ে

ঢেউয়ের আঘাতে উল্টে গেছে ওটা। মানিয়াফুরার লোকের ধারণা, বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন আপনি। আর এটাই বোঝাতে চেয়েছিল কারুণ।'

দাঁতে দাঁত চাপল রজন। 'কত্তবড় শয়তান!'

'হুঁ। আজ সকালে আমাদের হেলিকপ্টারটা নামতে দেখেননি আপনি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখেছি। দূর থেকে। দ্বীপের আরেক মাথায় ছিলাম তখন আমি। আসতে আসতেই চলে গেল ওটা।'

'আপনার শিয়ালগুলোর কি খবর?'

'খাবার তো পায় না তেমন। কোনমতে টিকে আছে। নিজের প্রাণ বাঁচাতেই অস্থির আমি, আর শিয়াল।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হুঁ। তা ঠিক।' মুখ তুলে তাকাল কুয়াশার দিকে। সাদা রঙ ধূসর হয়ে আসছে গোধূলির আগমনে। 'আমার মনে হয় যাওয়া উচিত। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।'

'কোথায় যাবে?'

'কেবিনে।'

'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। আসার সময় রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রবিন। কেবিনের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। 'আমি আসার পর কি কি ঘটেছে, জানি না কিছুই। কারুণকে বিশ্বাস নেই। মুসা ফিরেছে কিনা, তা-ও জানি না। আপনি এখানে লুকিয়ে থাকুন। আমি গিয়ে দেখে আসি। মুসাকে যদি এ পথে আসতে দেখেন, থামাবেন।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রজন। 'কারুণকে বিশ্বাস নেই। সাবধান থাকা ভাল।'

'ওদের কাছে পিস্তল আছে। কাজেই কারুণদের দেখলেও সামনে আসবেন না।'

'এখন আমি মরিয়া। এই লাঠিটা আছে। আমার হান্টিং নাইফটাও আছে,' কোমরে ঝোলানো বড় ছুরিটা দেখাল রজন।

'যা-ই থাকুক, তিনটে পিস্তলের কাছে কোন অস্ত্রই না এগুলো। ওদের দেখলেও বেরোবেন না আপনি।'

'ঠিক আছে,' হাসল রজন। 'তবে এখন গুলি করে মারলে তোমাদের অন্তত জানা থাকবে সে আমাকে খুন করেছে। নিখোঁজ করে দিতে পারবে না।'

রজনের হাসির জবাবে হাসি দিয়ে কেবিনের দিকে পা বাড়াল রবিন। সন্দেহে ভরা মন।

এগারো

রবিন যাওয়ার পর ওখানে এসে হাজির হয়েছে মুসা। কথামত তাকে বাধা দিয়েছে রজন। ওর নাম শুনে রবিনের মতই চমকে গেছে মুসা। খবরটা হজম করতে সময় লেগেছে তার।

রবিন তাকে কি কি করতে বলে গেছে, মুসাকে সব খুলে বলল রজন।

ঠিক এই সময় এসে হাজির হলো রবিন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এসেছ! এক মহা ঝামেলায় পড়া গেছে।'

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'কারুণ আর তার দোস্তরা গিয়ে কেবিনে ঠাঁই নিয়েছে,' জানাল রবিন। 'কারুণের বোটটার বোধহয় কিছু হয়েছে।'

'কি আর হবে। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি আমি। বোটটা কারুণের না। ফারিঙ্গার। টুপি পরা যে লোকটা তার সঙ্গে কেবিনে ঢুকেছিল, ওর নামই ফারিঙ্গা।'

'কিন্তু ডোবালে যে, এখন তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতগুলোও দ্বীপে আটকা পড়ল।'

'পড়ার জন্যেই তো পুড়িয়েছি। নইলে মালগুলো বের করে নিয়ে পালিয়ে যেত।'

'কিন্তু তুমি তো গেছিলে খাবার আনতে।'

'তাই তো করেছি। বোট পোড়ানোর বুদ্ধিটা করলাম খাবারগুলো নেয়ার পর। কিশোর সব সময় বলে না, সুযোগ হাতছাড়া করবে না, কাজে লাগাবে। সেটাই তো করেছি। নাকি খারাপ কিছু করলাম?'

'কারুণের খবর জানো নাকি?'

'তার দুই দোস্তকে নিয়ে আমার আগে আগে দৌড়ে যেতে দেখলাম। মনে হলো খুবই উদ্বিগ্ন।'

'বোট পুড়িয়ে দিয়েছ, হবেই। ওরা এখন কেবিন দখল করে বসে আছে। অশোকের কি খবর?'

'জানি না। শেষবার দেখা পর্যন্ত ওদের সঙ্গেই ছিল। ও, কিংবা নোয়াখালির লোকটা আর ফেরেনি। তারমানে কোথাও রেখে আসা হয়েছে ওদের।'

'কি করব আমরা তাহলে এখন?' নিজেকেই প্রশ্ন করল রবিন। 'অশোককে খুঁজতে বেরোব, না কেবিনে কিশোরকে সাহায্য করতে যাব? কারণকে বিশ্বাস নেই। দু'জনকেই খুন করতে পারে ও।'

'চিন্তার কথাই,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'একসঙ্গে দুটো সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না। আমি কেবিনে যাওয়ার পক্ষপাতী। অশোকের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।'

'সবার কি একসঙ্গে কেবিনে যাওয়ার দরকার আছে? আমি তো অশোকের খোঁজে যেতে পারি,' রবিন বলল।

'এই অন্ধকারে একা একা দ্বীপে ঘুরে বেড়ানোটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পাহাড়ের কিনার থেকে পা ফসকালে ছাতু হয়ে যাওয়া লাগবে। বিষাক্ত সাপের ভয় আছে। খাবারের অভাবে শিয়ালগুলোও পাগলা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

কথা বলল রজন, 'এ ভাবে তর্ক করতে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। তোমাদের কাছে পিস্তল আছে?'

'আছে,' মুসা বলল।

'তুমি পিস্তল পেলে কোথায়?' রবিন অবাক।

হাসল মুসা। 'ফারিঙ্গার বোটে।'

'দাও ওটা আমাকে,' হাত বাড়াল রজন।

ভ্রূকুটি করল মুসা, 'কি করবেন?'

'দাও না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রজনের কণ্ঠ। 'দিলেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু গোলাগুলি করাটা ঠিক হবে না তো।'

'তোমরা কি করবে জানি না। তবে কারণের মত ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গেলে গোলাগুলি ছাড়া উপায় নেই, এটুকু বোঝা হয়ে গেছে আমার। দুই-দুইবার আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে সে। এবার খানিকটা খেল আমিও ওকে না দেখিয়ে ছাড়ছি না।'

এতক্ষণ মুসা আর রবিন তর্ক করছিল। নতুন তর্ক জুড়ে দিল রজন। হঠাৎ হাত তুলল মুসা। কান পাতল। 'আস্তে! কে যেন আসছে।'

দ্রুত এগিয়ে আসছে শব্দ। দৌড়ে আসার মত। জোরে জোরে হাঁপানি শোনা গেল। একটু আগে মুসা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিক থেকে আসছে শব্দটা। উত্তেজনায় টানটান হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। তাকিয়ে আছে কুয়াশায় ঢাকা ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে। পিস্তল বের করে ফেলেছে মুসা।

অবশেষে কাছে এল লোকটা। অশোক। ওদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাও সব! ও আমাকে তেড়ে আসছে।'

'কে?'

'কারণের লোক। লাতু মিয়া।'

কিন্তু পালানোর সময় পাওয়া গেল না। কাছে চলে এল লাতু মিয়া। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

'কাউকে খুঁজছেন নাকি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আরে, আমনে ইয়ানে!' চোখ পড়ল মুসার হাতের পিস্তলটার দিকে। 'না না, কিয়া কয়। খুঁজুম কা?'

'ভাল। তাহলে যেদিক থেকে এসেছেন, ফিরে যান। তাতেই ভাল হবে আপনার।'

'কিন্তু আমার মালিক আমারে কাডি ফালাইব যদি হেতেনরে ন লই যাই,' অশোককে দেখাল লাতু মিয়া।

'আর নিয়ে যেতে চাইলে আমি আপনাকে গুলি করব,' শীতল কণ্ঠে হুমকি দিল মুসা। 'কোনটা ভাল মনে করেন?'

'আল্লারে আল্লা, কি বিফদে ফইড়লাম!' দ্বিধা করতে লাগল লাতু মিয়া। শেষে ফিরে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করল। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, গুল্লি করন লাইগ্‌দ ন। আমি চলি যাইয়ের।'

দ্রুত ঘুরে রওনা হয়ে গেল লাতু মিয়া।

'একটা সমস্যার সমাধান হলো।' অশোকের দিকে ফিরল মুসা। 'পালালে কিভাবে?'

'আমাকে ওই ভাঁড়টার কাছে রেখে চলে গেল কারণেরা। ও আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে পায়খানা করতে গিয়েছিল। এই সুযোগে দড়ি খুলে পালালাম।' রজনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল অশোক। 'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে না? কোথায় দেখেছি?'

'ইনি এই দ্বীপের মালিক,' রবিন বলল। 'ওঁকে তো তোমার চেনার কথা। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। এতটাই বদলে গেছে উনি, তুমিও চিনতে পারছ না। যাকগে, এখন প্রশ্ন শুরু কোরো না। জবাব দেয়ার সময় নেই। কেবিনে কিশোরের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাদের। কারণের দল কেবিনটা দখল করে নিয়েছে।'

'ওরা বলাবলি করছিল কেবিনে রাত কাটাবে,' অশোক বলল। 'পোড়া মোটর বোটটা দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে ওদের। কি করে আগুন লাগল জানো নাকি তোমরা কিছু?'

'মুসা লাগিয়েছে,' রবিন বলল। 'কিন্তু বললাম না, এখন প্রশ্ন করবে না। চলো, সোজা কেবিন।'

'পিস্তলটা দিলে না,' রজন বলল।

'কিন্তু আপনি পিস্তল দিয়ে কি করবেন বুঝতে পারছি না,' ভরসা পাচ্ছে না মুসা।

রেগে গেল রজন। মাটিতে পা ঠুকে বলল, 'এ দ্বীপটা আমার

সম্পত্তি। বেআইনীভাবে কিছু লোক আমার দ্বীপে নেমেছে।'

'তো?'

'তো এই, আমার সম্পত্তি আমাকে রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্যে অস্ত্র দরকার। দেবে কিনা বলো?'

পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল মুসা। 'এই নিন। তবে মানুষ-টানুষ মারবেন না দয়া করে।'

জবাব দিল না রজন। পিস্তলটা চোখের সামনে এনে দেখতে লাগল।

খাবারের কথা মনে পড়ল মুসার। 'ওহ্‌হো, খাবারগুলো তো ফেলে এসেছি। এত কষ্ট করে আনলাম, ফেলে রেখে যাব নাকি।' রবিনের দিকে তাকাল। 'এক মিনিট দাঁড়াও। আমি যাব আর আসব।'

তাড়াতাড়িই ফিরল মুসা। কাঁধে খাবারের ব্যাগ। অশোকের হাতে দিয়ে বলল, 'তুমি রাখো। আমার অন্য কাজ আছে।' রজনকে বলল, 'এগোন। পিস্তলটা যেহেতু আপনার হাতে, আপনিই আগে আগে যান।'

'যাচ্ছি। তোমাদের কিছুই করতে হবে না,' পিস্তল হাতে নিয়ে যেন বাঘের সাহস পেয়ে গেছে রজন। 'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। দেখো না ব্যাটাদের কি শায়েস্তা করি আমি।'

'আর যা-ই করেন,' অনুরোধ করল রবিন, 'গুলি চালাবেন না। কিশোরকে বিপদে ফেলে দেবেন তাহলে।'

'গোলাগুলি হবে না,' আশ্বস্ত করল রজন। 'কথা না বাড়িয়ে চলো তো। হাঁটো।'

মুসার দিকে তাকাল রবিন। চোখে উদ্বেগ। রজনের আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও তার মাঝে সংক্রামিত হলো না। বরং বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে।

কেবিনের কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল ওরা। দরজার কাছে গিয়ে হাত তুলে থামতে ইশারা করল রজন। ভেতর থেকে উত্তপ্ত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। খুব সাবধানে দরজার গায়ে হাত রাখল সে। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে ফাঁক করল এক ইঞ্চি। আচমকা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল পুরোটা। উদ্যত পিস্তল হাতে লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। 'খবরদার! পিস্তল ফেলে দাও!' চিৎকার করে উঠল।

সব ক'জনই দরজার দিকে পেছন করে ছিল, একমাত্র কিশোর ছাড়া। কেউ নড়ল না।

'ফেলো!' আবার চিৎকার করে উঠল রজন। 'দুই সেকেন্ড সময় দিলাম। তারপরই গুলি চালাব।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকাল কারণ। এক ঝলক রজনকে

দেখল। পিস্তলটা ফেলে দিল মেঝেতে।

'শেষবারের মত বলছি তোমাদেরকে,' অন্য দু'জনকে ধমক দিল রজন। 'জলদি ফেলো।'

আরও দুটো পিস্তল মাটিতে পড়ার শব্দ হলো।

'মুসা, তুলে নাও ওগুলো,' রজন বলল।

ঘরে ঢুকল মুসা। লাথি মেরে প্রথমে সরিয়ে দিল ঘরের প্রান্তে, কারুণ আর তার দুই সঙ্গীর কাছ থেকে দূরে, যাতে ও তোলার সময় সুযোগ বুঝে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। তারপর তুলে নিয়ে একটা রাখল নিজের হাতে, বাকি দুটো পাচার করে দিল রবিনের কাছে।

রজনের দিকে তাকিয়ে আছে কারুণ। চোখে আগুন ঝরছে। 'তাহলে তুমি।'

'হ্যাঁ, আমি, খুনে জানোয়ার কোথাকার,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোল রজনের। 'আর কার কথা ভেবেছিলে? উল্টোপাল্টা আচরণ খালি করে দেখো, মাত্র একটা, সীসা ঢুকিয়ে ঝাঁঝরা করে দেব তোমার নোংরা চামড়াটা।'

সামান্যতম নড়েনি এতক্ষণ কিশোর। 'যাক, সময়মতই এলে তোমরা,' দুই সহকারীকে বলল সে। 'আমার তো দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল ভেবে, এত দেরি করছ কেন।' রজনকে দেখাল, 'এই ভদ্রলোকটি কে?'

জবাব দিল রবিন, 'রজন মুনিআপ্পা।'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। 'আপনি বেঁচে আছেন! খুব খুশি হলাম দেখে।'

'এই ইঁদুরগুলোকে এই ঘরের মধ্যে রাখারই ইচ্ছে নাকি তোমার?' পিস্তলের ইঙ্গিতে কারুণ আর দুই সঙ্গীকে দেখাল রজন।

'না। ওরা বেরিয়ে গেলে ঘরের বাতাস অনেক বেশি মধুর হয়ে উঠবে।'

তিন ডাকাতের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল রজন, 'বেরোও!'

'এ ভাবে রাতের বেলা এই কুয়াশার মধ্যে বের করে দেবেন আমাদের,' ককিয়ে উঠল টুপি পরা নাবিক, যার নাম ফারিঙ্গা। 'আপনাদের লোকই তো আমাদের বোট পুড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় থাকব আমরা?'

'বাইরে যাওয়ার সুযোগ যে দিচ্ছি, এতেই খুশি থাকো। জলদি করো, নইলে মেজাজ বিগড়ে যাবে আমার। পিস্তলের ট্রিগার টেপার জন্যে আঙুল সুড়সুড় করছে।'

'খাব কি আমরা?' কারুণের প্রশ্ন। 'আমাদের কাছে খাবার নেই।'

'একে অন্যকে খেয়ে ফেলোগে না, অসুবিধে কি। আর যদি খেতে

না পেয়ে মরে যাও, আমার শিয়ালগুলোর জন্যে ভাল হবে। বহুদিন অভুক্ত রয়েছে ওগুলো। তোমাদের কল্যাণে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন ডাকাত। কিশোরের দিকে তাকাল কারুণ। অশোকের দিকে তাকাল। কিন্তু কারও চোখেই তার জন্যে সামান্যতম করুণা দেখতে পেল না। বাধ্য হয়ে সারি দিয়ে একে একে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উঠে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। ফিরে তাকাল। 'দারুণ দেখালেন।'

বারো

বাইরে তিন ডাকাতের পদশব্দ মিলিয়ে গেলে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'এখন কি করব?'

'কি করব মানে?'

'মানে এরপর কি কাজ আমাদের?'

'কিছুই না। রাতের বেলা এই অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে একটা ঘর পেয়েছি, আরাম করব। কথা বলব। তোমরা কে কি করলে বলো। মুনিআপ্পাকে কোথায় পেলে? দাঁড়াও দাঁড়াও, কথা শুরু করার আগে সবচেয়ে জরুরী কথাটা জেনে নিই—খাবার পেয়েছ?'

'পেয়েছি,' হাসিমুখে জানাল মুসা।

'কোথায় ওগুলো?'

'ব্যাগের মধ্যে। অশোক, ব্যাগটা ঠেলে দেবে?'

'দারুণ একটা কাজ করেছ,' কিশোর বলল। 'দেখা যাক, কি কি খাবার আছে। ভেতরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে আমার। ভরাট করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে শরীর। খাবার কি ওদের বোটেই পেলে?'

'হ্যাঁ।'

দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না রবিনের। 'এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব তো আমরা? ডাকাতগুলো যদি ফিরে আসে আবার?'

'আসবে বলে মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'ওদের পিস্তলগুলো তো আমাদের কাছে। খালি হাতে আসতে সাহস পাবে না।'

'যদি অন্য কোনও ফন্দি করে?'

'করেই দেখুক এবার,' রজনের রাগ যায়নি। 'তবে সাবধান থাকা

ভাল। দাঁড়াও, দরজার মাঝখানের ওই ডাণ্ডাটা লাগিয়ে দিই। ঝড়ের দিনে বাতাসের ধাক্কায় যাতে খুলে না যায় সেজন্যে ওটা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।' ঘরের কোণ থেকে বড় শক্ত একটা কাঠের ডাণ্ডা তুলে এনে দরজার মাঝখানে দুই পাশের দুটো হুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে। 'ওই ছাগলগুলোর মাথায় যদি সামান্যতম ঘিলু থাকে, তাহলে আর এ মুখো হবে না। বনের দিকে চলে গেলেই ভাল করবে, খোলা জায়গার চেয়ে ওখানে ঠাণ্ডা কয়েক ডিগ্রী কম। তবে ওরা মরল কি বাঁচল তাতে কিচ্ছু এসে যায় না আমার।'

'কিন্তু আমাদের কি হবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'এই কুয়াশা তো আমাদের সর্বনাশ করে দিল।'

'কাল কুয়াশা থাকবে না।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'এই এলাকায় আমার জন্ম। আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারি। বলে দিলাম, কাল কুয়াশা থাকবে না, দেখো। ঝকঝকে দিন পাওয়া যাবে।'

'সেইটাই তো চাই,' কিশোর বলল। 'কাজ সারতে পারব তাহলে। মুসা, ব্যাগটা খোলো তো। দেখি কি নিয়ে এসেছ। রাতে পাহারা রাখার দরকার আছে কিনা আমাদের খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে।'

টেবিলের ওপর ব্যাগটা খালি করল মুসা। আমন্ত্রণ জানাল সবাইকে, 'এসো, বসে পড়ো।'

'তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, মুসা, ভাষা পাচ্ছি না,' কিশোর বলল। 'ভাগ্যিস বোটে যাওয়ার বুদ্ধিটা বেরিয়েছিল তোমার মাথা থেকে।'

হেহ্ হেহ্ করে হাসল মুসা। 'খাবার জিনিসটা তাহলে সাংঘাতিক জিনিস, স্বীকার করছ।'

'সাংঘাতিক মানে! সবচেয়ে প্রয়োজনীয়,' বলে ফলের রসের একটা ব্যাগ টেনে নিল কিশোর।

সবাই যার যার মত খাবার টেনে নিতে লাগল।

অশোকের দিকে তাকাল কিশোর। 'আসল কথাটা শুনি এবার। গহনার ব্যাগটা ডাকাতগুলোর হাতে পড়েছে?'

মাথা নাড়ল অশোক। 'না। আমি যতক্ষণ ওদের সঙ্গে ছিলাম, ততক্ষণ অন্তত পড়েনি।'

'কোথায় আছে, জানে ওরা?'

'মোটামুটি ধারণা আছে। ধস নামা জায়গাটা ওদের দেখাতে বাধ্য হয়েছি আমি। কি করব, বলো। বহু চাপাচাপির পরেও বলিনি। শেষে

পাহাড়ের ধারে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিতে চাইল।'

'না, আর কিছু করার ছিল না তোমার। সকালে উঠে আগে ওখানে যাব আমরা।' রজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'মুনিআপ্পা, মাটি খোঁড়ার জন্যে শাবল-কোদাল কিছু পাওয়া যাবে আপনার ঘরে?'

'পাবে,' মাথা ঝাঁকাল রজন। 'বেলচাও আছে।'

'ওখানে গেলে সম্ভবত একটা কোদালও পাওয়া যাবে,' মুসা বলল। লাতু মিয়াকে কিভাবে কোদাল দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে, সেই গল্প বলল। সবাই হাসতে লাগল।

'ধসের কাছেই পড়ে আছে ওটা,' অশোক জানাল। 'আমি থাকতে থাকতেই লাতু মিয়া গিয়ে হাজির হয়েছে। কারণ তো অবাক। কে পাঠিয়েছে ওকে, শোনার পর মাথা গরম হয়ে গেল তার। বুঝে ফেলল, তোমাদের কারও কাজ। দলবল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল বোটের দিকে।'

খাবারগুলো নেয়ার পর বোটটা কিভাবে পুড়িয়েছে কিশোরকে জানাল মুসা।

'বোটটাকে পুড়তে দেখে কি পরিমাণ গালাগাল যে করেছে ওরা তোমাকে, শুনলে কান গরম হয়ে যেত,' অশোক জানাল। 'খেপামিতে পারলে ন্যাংটো হয়ে নাচে। কিন্তু কিছুই আর করার ছিল না তখন। বোটটা পুড়ে শেষ। ও ভাল কথা, বোট পোড়ার সময় প্রচুর ধোঁয়া উঠছিল। আমার মনে হয় ওই ধোঁয়া একটা জাহাজ থেকে দেখেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'দেখেছি। আমাকে তখন লাতু মিয়ার কাছে রেখে চলে গিয়েছিল কারুণেরা। দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছিল ওটা। মাছধরা জাহাজ বলেই মনে হচ্ছিল। কুয়াশার মধ্যে ভাবলাম মনের ভুল। পরে ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসায় বুঝলাম, না, সত্যি আসছে।'

'কারুণরা জানে জাহাজটার কথা?'

'কি জানি।'

'জানলেই বা কি?' মুসার প্রশ্ন।

'জানলে অনেক কিছু,' কিশোর বলল। 'বোট পোড়ার ধোঁয়া দেখে যদি এসে থাকে জাহাজটা, কাছে এলে নিশ্চয় কিছু না কিছু আলামত চোখে পড়বে ওদের। পোড়া বোটের অনেক কিছুই পানিতে ভেসে থাকে। ফিরে গিয়ে মানিয়াফুরায় রিপোর্ট করবে। সঙ্গে রেডিও থাকলে এখান থেকেও যোগাযোগ করতে পারে বন্দরের সঙ্গে। দ্বীপে নেমে খোঁজখবর করতেও আসতে পারে জাহাজের ক্যাপ্টেন। বাই চান্স যদি কারুণের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ওরা ওদের কি বোঝাবে কে জানে।'

খেতে খেতে এ নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলল। খাওয়া শেষ হলো। অবশিষ্ট খাবার তাকে তুলে রেখে দিল ওরা।

দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখে এল মুসা। 'কুয়াশা আছে এখনও। তবে বোধহয় মুনিআপ্পার কথাই ঠিক। আবহাওয়া পরিষ্কার হচ্ছে। আকাশে তারা দেখলাম।'

'ওদের কোন চিহ্ন দেখলে না?' জানতে চাইল কিশোর।

'কারুণদের? নাহ্। কোন শব্দও শুনলাম না। অবশ্য, এসেই বা আর কি করবে। পিস্তল-টিস্তল কিছুই নেই ওদের কাছে।'

'ওদের বিশ্বাস নেই, মাথাভরা শয়তানি বুদ্ধি। অসাবধান হওয়া চলবে না। আবহাওয়া পরিষ্কার হলে ভোরবেলাই চলে আসবে চৌহান। সুতরাং আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সেকেন্ডও দেরি করা চলবে না আমাদের, একজনকে চলে যেতে হবে ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে। যে জাহাজটার ধোঁয়া দেখেছে বলছে অশোক, ওটাও মানিয়াফুরায় ফিরে গিয়ে খবর দিতে পারে। আর দিলে অবশ্যই চৌহানের কানে যাবে।'

আরও খানিক আলোচনার পর কিশোর বলল, 'অকারণে ঘুম নষ্ট করে আর লাভ নেই। খুব ভোরবেলা আবার উঠতে হবে। পাহারা দেয়াটা জরুরী। পালা করে করে দেব। ওই শয়তানগুলোকে বিশ্বাস নেই, বললাম না। বলা যায় না, শোধ নেয়ার জন্যে কেবিনে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে যেখানে পারল, হেলান দিয়ে বসে কিংবা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। সবার আগে পাহারায় বসল কিশোর। সারাটা দিন যে চেয়ারে বসে কাটিয়েছে, সেটাতেই বসে রইল সে। কোলের ওপর রেখে দিল গুলিভরা একটা পিস্তল।

গড়িয়ে চলল সময়। বাইরে অখণ্ড নীরবতা। তবে মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে এল শিয়ালের ডাক।

তেরো

ঘটনাটা ঘটার সময় ঘুমিয়ে ছিল কিশোর।

পাহারার পালা ছিল তখন রজনের। সারা রাত বদ্ধ ঘরে থেকে থেকে খোলা বাতাসের জন্যে আইঢাই করে উঠেছিল তার প্রাণটা। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিল। আকাশের দিকে চোখ।

ঠিক এই সময় গর্জে উঠল রাইফেল। গুলিটা কোথায় লাগল বলতে পারবে না সে। তবে একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে লাগিয়ে দিল দরজা।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। হাতে উদ্যত পিস্তল। 'কে গুলি করল?'

মুসা আর রবিনও জেগে গেছে।

'আপনি গুলি করেছেন?' রজনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' রজন বলল। জানাল পুরো ঘটনাটা।

রেগে গেল কিশোর। 'সাবধান হতে বলেছিলাম সবাইকে।'

'কি করে জানব বাইরে রাইফেল নিয়ে বসে আছে কেউ?'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'যে-ই এখন দরজা খুলে বেরোতে যাব, গুলি খাব।'

'ঘরের মধ্যে আমাদের আটকে ফেলার ব্যবস্থা করেছে,' রবিন বলল। 'আমরা বেরোতে পারব না। এই সুযোগে গুপ্তধন খোঁজা চালিয়ে যাবে ওরা।'

'কিন্তু সারাদিন ঘরে আটকে থাকা তো যাবে না,' রজন বলল। 'চৌহান এলে কি হবে?'

'তাড়াহুড়া করে হবে না,' কিশোর বলল। 'ভালমত ভেবে দেখা যাক। প্রথম প্রশ্ন, রাইফেল ওরা পেল কোথায়? ওদের কারও কাছেই ছিল না। থাকলে দেখতাম।'

'মোটর বোটে ছিল হয়তো,' রবিন বলল।

'ছিল না,' মুসা বলল। 'তাহলে আমার চোখে পড়ত। পিস্তলটা ছিল, তা-ই দেখে ফেললাম। আর যদি কোন জায়গায় লুকানো থাকেও কিছু, ওগুলো এখন সাগরের তলায়।'

'আগেই যদি হাতে নিয়ে নেমে থাকে ওরা?'

'তাহলেও দেখতাম। ওদেরকে ধসের কাছ থেকে ফিরতেও দেখেছি আমি, যেতেও দেখেছি। হাতে রাইফেল ছিল না। ছিল পিস্তল।'

'তাহলে পেল কোথায়?'

'সেটাই তো আমার প্রশ্ন,' কিশোর বলল। 'তবে পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং তাতে আমাদের গুপ্তধন খোঁজা শতগুণ কঠিন করে তুলেছে।'

'কিন্তু আমাদেরকে এখানে আটকে রাখতে পারলে লাভটা কি ওদের?' মুসার প্রশ্ন।

'ওই যে বললাম, নির্বিঘ্নে গুপ্তধন খুঁজতে পারবে।'

'কিন্তু গুপ্তধন খোঁজা আর কেবিন পাহারা দেয়া একসঙ্গে দুটো

কাজ কি করে করবে?'

'আমাদের দরজা আটকানোর জন্যে একজন লোকই যথেষ্ট,' জবাব দিল কিশোর। 'বাকি সবাই চলে যাবে ধসের কাছে গুপ্তধন খুঁজতে।'

'মাত্র একজন?' রজন বলল। 'তাহলে তো তাকে কাবু করে ফেলা যায়।'

'কিভাবে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'দরজাই তো খুলতে পারবেন না, গুলি শুরু করে দেবে।'

'কিন্তু এই ঝলমলে দিনে ঘরের মধ্যে আটকে বসে থাকতেও রাজি নই আমি,' রজন বলল।

'দাঁড়ান, ভাবতে দিন,' দুই হাতে কপাল টিপে ধরল কিশোর। তারপর হাতটা সরিয়ে এনে নিচের ঠোঁটে ঘনঘন চিমটি কাটল কয়েকবার। 'অকারণ ঝুঁকি নিতে গিয়ে গুলি খাওয়ার কোন মানে হয় না।' দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল একটা মুহূর্ত। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল দরজার কাছে। গুলির ফুটোটা খুঁজল। অনেক খুঁজেও পেল না ওটা। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের দেয়ালে লাগতে পারে। কিন্তু সেদিকটাতেও গুলি লাগার কোন চিহ্ন নেই। অবাক লাগল তার। ফিরে তাকাল রজনের দিকে। 'আপনাকেই গুলি করেছে তো?'

'বেরিয়েছি আমি। আমাকে ছাড়া আর কাকে করবে?'

'গুলিটা কতখানি দূর থেকে করেছে আন্দাজ করতে পারেন?'

'আট-দশ গজ হবে।'

'তারমানে আট-দশ গজ দূরে কোথাও লুকিয়ে আছে সে। অতখানি দূরে দরজা বরাবর ছোট একটা ঝোপ দেখেছি কেবল। আর তো কিছু নেই।'

'ঠিক। ওখানেই লুকিয়ে আছে। কতবার যে ভেবেছি ওটা সাফ করে ফেলব, করা আর হয়নি। করে ফেললে এখন আর এই বিপদের মধ্যে পড়া লাগত না।'

'হ্যাঁ, ওখানেই ঘাপটি মেরে আছে লোকটা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'প্রথমবার এই কেবিন পাহারা দেবে যে শাসিয়ে গিয়েছিল কারুণ, সেটা কার্যকর করেছে এবার।'

'তা তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু ওকে সরানোর ব্যবস্থা কি? দরজা খুলে দেখব নাকি আবার গুলি করে কিনা?'

'পাগল নাকি! পরীক্ষা করতে গিয়ে মরার ঝুঁকি নিতে যাবে। আমি ভাবছি, কাকে বসিয়ে রেখে গেল? কারুণ থাকবে না কোনমতেই, সে চলে যাবে ব্যাগ খুঁজতে। ব্যাগটা পাওয়ার সময় কাছে কাছে থাকতে

চাইবে।'

'তার দুই সহকারীর কেউ হতে পারে,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'লোকটাকে ঠেকানো যায় কিভাবে?'

'এক কাজ করা যেতে পারে,' রজন বলল। 'দরজা খুলে বেরিয়ে দৌড় দিতে পারি। তোমরা তখন ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকবে। এই সুযোগে আমি পৌঁছে যাব ঝোপের কাছে। পিস্তলের মুখে বের করে আনব লোকটাকে।'

'রিস্কি হয়ে যাবে।'

'এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। তবে দরজা খুলে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব, বন্দুক তোলারও সময় পাবে না সে।'

'সত্যি পারবেন?'

'পারব।'

'যদি পারেন, আমরা আপনাকে সাপোর্ট দিতে পারব। এমন গুলি শুরু করব, মাথা তুলতে দেব না ব্যাটাকে। ঝোপ থেকে বেরোতে বাধ্য করব।' জানালার দিকে তাকাল কিশোর। ধূসর আলো জানান দিচ্ছে দিনের আগমন। 'যা করার এখনই করতে হবে। চৌহান চলে আসার আগেই।'

'ঠিক আছে। পজিশন নাও তোমরা। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি,' রজন বলল।

'এখনও ভেবে দেখুন,' সাবধান করল কিশোর। 'মারাত্মক এক খেলা খেলতে যাচ্ছেন।'

'দেখেছি।'

'আমাদের গুলির লাইনের বাইরে থাকবেন। আপনি সামনে বাধা হয়ে গেলে আমরা তখন গুলি চালাতে পারব না।'

'বুঝতে পেরেছি।'

পিস্তল হাতে পজিশন নিল তিন গোয়েন্দা। দরজার পাশে এমন করে দাঁড়াল মুসা যাতে তাকে দেখা না যায়, অথচ সহজেই ডান হাতটা বের করতে পারে। রবিন গেল আরেক পাশে। কিশোর দরজা বরাবর মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। অশোক দরজার কাছ থেকে সরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল মেঝেতে।

'আমরা রেডি,' রজনকে জানাল সে। 'পিস্তল হাতে ছুটতে থাকবেন। গুলি করার চেষ্টা করবেন না। আমাদের পিস্তলের সামনে থেকে দূরে থাকবেন। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

শিয়ালের ক্ষিপ্রতা দেখাল রজন। এক ঝটকায় দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। একপাশে সরে গিয়ে ঘুরপথে ছুটল ঝোপটার দিকে।

গুলি চালানো শুরু করল তিন গোয়েন্দা। বদ্ধ ঘরে বিকট শব্দ হতে লাগল। বাতাসে করডাইটের মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধ। গুলির শব্দের মাঝেই কানে এল ভীত আর্তচিৎকার, 'বাউরে! মারি ফালাইল!'

হুড়মুড় করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল লোকটা।

'থামো!' গুলি বন্ধ করার আদেশ দিল কিশোর। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

পাশে এসে দাঁড়াল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল মুসা, 'লাতু মিয়া!'

'যেতে দাও,' ভেতরে আর কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে ঝোপের দিকে পা বাড়াল কিশোর। দেখার পর বলল, 'ওই শয়তানগুলো নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ব্যবহার করেছে এই বোকা লোকটাকে। গুলি খেয়ে যদি মরে, ও মরবে, ওদের কি?' ঝোপ থেকে একটা অটোমেটিক রাইফেল বের করে আনল সে।

'ওকে রেখে যাওয়াতেই বেঁচে গেছে মুনিআপ্পা,' মুসা বলল। 'ট্রিগার টেপা ছাড়া আর বোধহয় কিছুই করতে জানে না লাতু মিয়া। সেজন্যেই গুলির ফুটো পাওয়া যায়নি। নিশানা এতই খারাপ ওর, এতবড় একটা ঘরকেও সই করতে পারেনি।'

হাসল সে। রবিনও হাসল। কিন্তু কিশোর হাসল না। চিন্তিত ভঙ্গিতে রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'এটা পেল কোথায় ওরা?'

'জিনিসটা কিন্তু নতুন না,' মুসা বলল। 'ব্যবহার করা।'

ম্যাগাজিন খুলে দেখল কিশোর। ছয়টা গুলির মাত্র একটা খরচ হয়েছে। শূন্য খোসাটা টান দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। নতুন আরেকটা গুলি নিয়ে এল ব্রীচে। যাতে প্রয়োজন পড়লে গুলি করতে পারে। 'এটা দিয়ে পাগলা শিয়াল মারতে পারবেন,' রাইফেলটা রজনের হাতে তুলে দিল সে।

দূর থেকে ভেসে এল হেলিকপ্টারের শব্দ।

'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে যাচ্ছি আমি,' বলেই দৌড় দিল রবিন।

'দাঁড়াও!' ডাকল কিশোর। 'কেবিনের দিকে আসছে মনে হচ্ছে।'

বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে লাতু মিয়া। ফিরেও তাকাল না ওরা কেউ। গাছের মাথার ওপর দেখা দিল কপ্টারটা। কাছে এল। নামতে শুরু করল। তবে কিছুটা নেমেই থেমে গেল। ককপিট থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। রুমালের মত কিছু নাড়ছে। দৌড়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এল রবিন। রুমালে বাঁধা একটা কাগজ। তাতে লেখা:

সাবধান। কারূণ আর তার সঙ্গীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমি আগের জায়গাতেই নামতে যাচ্ছি।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'অস্ত্র কোথায় পেল কারূণ? আর সেটা চৌহান জানল কিভাবে? কারূণ যে এখানে আছে সেটাই বা জানল কি করে?'

'রাইফেল রহস্যের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই তো?' রবিন বলল, 'আমাদের সঙ্গে দেখা করার সময় রাইফেল ছিল না ওদের কাছে। নাকি অন্য কোনখানে রেখে দিয়েছিল, পরে বের করেছে?'

'মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এগুলোর একটাই জবাব—ওই মাছধরা জাহাজটা।'

'ওদের কাছে রাইফেল ছিল হয়তো, সেটা কিনে নিয়েছে কারূণ,' মুসা বলল।

'কিন্তু এ ধরনের মাছধরা নৌকা রাইফেল বহন করতে যাবে কেন? ওরা তো মাছ ধরে জাল দিয়ে, গুলি করে নয়। আর পানিতে রাইফেলের দরকার কি?'

'কি জানি বাপু!' হাত নাড়ল মুসা। 'মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।'

'চৌহান কিভাবে কারূণের কথা জেনেছে, সেটা অনুমান করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'মাছধরা জাহাজটা মানিয়াফুরায় গিয়ে খবরটা ছড়িয়েছে। চৌহানেরও কানে গেছে। এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা নেই।'

'তা-ই হবে।'

'কিংবা আরেকটা ঘটনা ঘটতে পারে,' রবিন বলল। 'মাছধরা জাহাজটাতে করে কারূণেরা মানিয়াফুরায় চলে গিয়েছিল। ওখান থেকে অস্ত্র জোগাড় করে আবার ফিরে এসেছে।'

'কিন্তু ফিরল কিভাবে?'

'জানি না।'

'অনুমান করে করে অত মগজ খাটানোর দরকারও নেই। চৌহানের কাছ থেকেই জানতে পারব। রবিন, ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে চলে যাও।'

'তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে কোথায়?'

'ধসের কাছে যাচ্ছি আমরা। লাতু মিয়া ওদিকেই দৌড় দিয়েছে। কারূণরাও নিশ্চয় ওদিকেই আছে।'

'চৌহানকে নেব আমার সঙ্গে?'

'সেই ভার ওর ওপরই ছেড়ে দিয়ো। ভাল মনে করলে যাবে। তবে পজিশনটা জানিয়ো ওকে।'

'ঠিক আছে।' দৌড়াতে শুরু করল রবিন।

'চলুন,' রজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ডাকাতগুলোকে কোনমতেই পালাতে দেয়া যাবে না।'

ধসের দিকে রওনা হলো ওরা চারজনে। বেশি দূরে যেতে হবে না ওদের।

রজনের আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী একেবারে সঠিক। কুয়াশার যা-ও বা একটু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট রয়েছে তাড়িয়ে দিয়ে সাগর থেকে মেঘমুক্ত আকাশে চড়ছে সূর্য। কোন কোন গাছের মাথায় অতি হালকা রেশমী কাপড়ের মত ঝুলে রয়েছে এখনও দু'চার টুকরো কুয়াশা।

চোদ্দ

ধসের দিকে কোনাকুনি এগিয়ে চলেছে দলটা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেলে সোজা হয়। সহজ পথও এটাই। জায়গাটা বেশ খোলামেলাও। দ্বীপঘেরা পাহাড়ের বেশির ভাগ জায়গাতেই জঙ্গল। কিন্তু ঝড়ের আঘাত এদিকটাতেই সবচেয়ে বেশি লাগে বলে গাছপালা ঝোপঝাড় কোন কিছুই বড় হতে পারে না।

অর্ধেক পথ এসে থমকে দাঁড়াল কিশোর। পাহাড়টা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একটা খাঁড়িমত ঢুকে গেছে দ্বীপের ভেতরে, সেখানে একটা প্রাকৃতিক বন্দরে নোঙর ফেলেছে একটা ছোট মাছধরা জাহাজ।

মুসার দিকে তাকাল সে, 'কি বুঝলে?'

'আর কি। আমাদের প্রশ্নের জবাব।'

'হ্যাঁ, তবে সব প্রশ্নের নয়। দেখো, ডেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওই জাহাজের নাবিকগুলোও নিশ্চয় এতটা পাগল হয়নি যে কারণের সঙ্গে যোগ দেবে। অন্য কিছু ঘটেছে। চলো, গেলেই বোঝা যাবে।'

আরও শ'খানেক গজ পেরোনোর পর সামনে পাথরের একটা গোল স্তূপমত পাওয়া গেল। সেটা ঘুরে অন্যপাশে আসতেই ধসটা চোখে পড়ল। উল্লসিত চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা গেল ওখান থেকে। কিছু একটা ঘটেছে।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। পেছনে বাকি সবাইও দাঁড়িয়ে গেল। ধসের জঞ্জাল আর খোঁড়া মাটির কাছে দাঁড়িয়ে আছে কারণ। হাতে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ।

'ওটাই তো,' গুঙিয়ে উঠল অশোক। 'জিনিসগুলো পেয়ে গেছে ওরা।'

কারও মুখে কথা নেই। সবাই তাকিয়ে আছে চুপচাপ। কারুণের কাছে দাঁড়ানো তার দুই সহকারী। খানিক দূরে লাতু মিয়াকে দেখা গেল, ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করে পালিয়েছে বলেই বোধহয়।

হঠাৎ করেই ঘটতে শুরু করল নাটকীয় ঘটনা। ক্লাইম্যাক্সে চলে যেতে লাগল নাটক। শুরুটা হলো বেচারা লাতু মিয়াকে দিয়ে।

তার ওপর চোখ পড়তেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কারুণ। চিৎকার করে কিছু বলল। এতদূর থেকে কথা বোঝা গেল না, তবে অনুমান করা গেল জায়গা ছেড়ে চলে আসায় তাকে ধমকাচ্ছে কারুণ। পিছিয়ে যেতে শুরু করল লাতু। পালাতে চাইছে মনে হয়। আচমকা ঘুরে দিল দৌড়। পকেট থেকে পিস্তল বের করে ট্রিগার টিপে দিল কারুণ। যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল লাতু। গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে নেমে একটা পাথরে আটকে গেল তার দেহ। আর নড়ল না।

চোখের সামনে এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল গোয়েন্দারা। একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই 'খুনে শয়তান কোথাকার!' বলে গাল দিয়ে হাতের রাইফেলটা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রজন। নিশানা করতে গেল কারুণকে।

বাধা দিল কিশোর, 'কি করছেন? থামুন, থামুন।'

'কিভাবে লোকটাকে গুলি করে মেরে ফেলল দেখলে!'

'দেখলাম। কিন্তু আপনি ওকে গুলি করতে গেলে তো আপনিও ওরই মত হয়ে গেলেন। নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না।'

রজন নিরস্ত হলেও কারুণের বিরুদ্ধে যাবার লোকের অভাব হলো না। রুখে উঠল তার দুই সঙ্গী। প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলেছে দূর থেকেও বোঝা গেল। বেশি রেগে গেছে ফারিঙ্গা। লাতু তার কর্মচারী ছিল। এক কথা, দু'কথা। কারুণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে কারুণের বুকে ঠেকিয়ে গুলি করে বসল ফারিঙ্গা। কারুণের হাত থেকে ব্যাগ খসে পড়ল। কাত হয়ে ঢলে পড়ল সে। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে একটা গাছে আটকে গেল।

'খাইছে!' চোখের সামনে দু'-দুটো খুন হয়ে যেতে দেখে কণ্ঠস্বর খসখসে হয়ে গেছে মুসার। 'নিজেরা নিজেরাই তো সেরে ফেলছে সব।'

'কোনখান থেকে অস্ত্র পেয়েছে ওরা,' কিশোর বলল। 'সুযোগ বুঝে একে অন্যকে সরিয়ে দিচ্ছে এখন, গুপ্তধনের ভাগীদার কমানোর

জন্যে।'

'ভালই তো,' রজন বলল। 'পৃথিবী থেকে দু'চারটে শয়তান কমছে।'

'আমি ভাবছি জাহাজটার কথা,' রজনের কথা কানে যায়নি যেন কিশোরের। 'ফারিঙ্গারা ওটাতে উঠে পড়লে আর ধরা যাবে না।'

'দেব নাকি খোঁড়া করে?' রাইফেলের গায়ে থাবা দিল রজন।

'দেখা যাক। তেমন বুঝলে তখন বলব। তবে আগে ভালভাবে চেষ্টা করে দেখি।'

নতুন মোড় নিল নাটক। ফিরে তাকিয়ে কিশোরদের দেখে ফেলল ফারিঙ্গার সহকারী। ফারিঙ্গার বাহুতে হাত রেখে দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে আরও আগেই দেখে ফেলত গোয়েন্দাদের।

'চলুন, এগোনো যাক,' কিশোর বলল।

চিৎকার করে উঠল ফারিঙ্গা, 'খবরদার, এক পা এগোবে না আর। গুলি খাবে!'

হুমকিতে কান দিল না কিশোর। এগিয়ে চলল। পিছে পিছে চলল মুসা, রজন ও অশোক।

'কি বললাম শোননি!' আবার চিৎকার করে বলল ফারিঙ্গা। মাটিতে পড়ে থাকা ক্যানভাসের ব্যাগটা তুলে নিল সে।

'পিস্তল ফেলে দিন,' চিৎকার করে হুকুম দিল কিশোর।

লোকগুলো বুঝতে পারল হুমকিতে কাজ হবে না। সঙ্গী লোকটাকে কি যেন বলল ফারিঙ্গা। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সাগরের দিকে দৌড় দিল সে। ব্যাগ আর পিস্তল হাতে ফারিঙ্গাও ছুটল তার পেছনে।

'জাহাজে উঠে পড়লে আর ধরতে পারব না,' বলে কিশোরও কোনাকুনি দৌড় দিল জাহাজের দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করল ফারিঙ্গার সহকারী। কিন্তু পিস্তলের জন্যে রেঞ্জ অনেক বেশি। লাগাতে তো পারলই না, নিশানার কাছেও আনতে পারল না। কিশোরদের সামনে একটা পাথরে লেগে চলটা তুলল বুলেট।

'আমাদের কেউ জখম হওয়ার আগেই দিই ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে,' কিশোরের অনুমতি চাইল রজন।

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। আর বোধহয় গুলি করা ছাড়া গতি নেই। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তারপর বলল, 'দেখি, আরেকটু সুযোগ দিই।'

হুমকি দিল কিশোর। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল দু'বার। জবাবে

ফারিঙ্গারাও গুলি করতে করতে ছুটল।

'ধ্যাত্তোরিকা! আর তোমার কথা শুনছি না আমি!' বলে রাইফেল তুলল রজন।

গুলি করার আগেই নতুন ঘটনা ঘটল। থমকে দাঁড়াল দুই ডাকাত। সামনের গাছের আড়াল থেকে তিনজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। চৌহান, রবিন আর নাবিকের পোশাক পরা একজন লোক। চৌহানের হাতে রাইফেল। রবিনের হাতে পিস্তল।

রাইফেল তাক করে হাঁক দিল চৌহান, 'পিস্তল ফেলো! জলদি!'

বেকায়দায় পড়ে গেল দুই ডাকাত। সামনেও শত্রু, পেছনেও শত্রু। নিজেদের মধ্যে দ্রুত কি যেন আলোচনা করল দু'জনে। পালাতে পারবে না বুঝে গেছে। পিস্তল আর গহনার ব্যাগটা ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল মাথার ওপর।

একটা গুলিও করতে না পারায় হতাশই মনে হলো রজনকে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাইফেল নামাল সে।

এগিয়ে এল চৌহানের দল। কিশোররাও এগোল। একসঙ্গে ডাকাতগুলোর কাছে পৌঁছাল দুটো দল।

ফারিঙ্গা বলল, 'আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন কেন? কি করেছি আমরা?'

'সেটা পুলিশকে গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো।' পাশে দাঁড়ানো নাবিকের পোশাক পরা লোকটাকে দেখাল চৌহান, 'এই ভদ্রলোকের বোট চুরি করেছ কেন?'

ফারিঙ্গা জবাব দিল, 'আমরা চুরি করিনি। কারুণ করেছিল।'

'তোমরা তো তার সাথেই ছিলে। তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এতই মহৎ হবে, বাধা দাওনি কেন?' চারপাশে তাকাল চৌহান। 'কারুণ কোথায়?'

'মরে গেছে,' কিশোর বলল।

'মরে গেছে!'

ফারিঙ্গাকে দেখাল কিশোর। 'এই লোক গুলি করেছে ওকে। আমরা সবাই সাক্ষী।'

'আর কি করতে পারতাম?' কৈফিয়ত দিল লোকটা। 'কি ঘটেছে নিশ্চয়ই দেখেছ তোমরা; আমি না করলে আমাকে গুলি করত। আমার বাবুর্চিকেও মেরে ফেলেছে।'

কিশোরের দিকে তাকাল চৌহান। 'কি বলছে ও?'

'ঠিকই বলছে। ওরা কি নিয়ে তর্ক করছিল, আমরা শুনিনি। তবে গুলি করতে দেখেছি। ওই পাহাড়ের ওদিকটায়, ঢালের মধ্যে পড়ে আছে দু'জন লোক। এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে।'

'চলো তো দেখি।' পড়ে থাকা পিস্তল দুটো তুলতে গিয়ে ব্যাগটার ওপর চোখ পড়ল চৌহানের। 'এটাই সেই গহনার ব্যাগ নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

ব্যাগটাও তুলে নিয়ে মুসার হাতে দিল চৌহান।

ঢালে পৌঁছে প্রথমে কারুণের লাশটা পরীক্ষা করল ওরা। মরে গেছে। তারপর খুঁজতে লাগল লাতু মিয়াকে।

'আশ্চর্য!' কিশোর বলল। 'এখানেই তো ছিল! গেল কোথায়?'

যে পাথরটায় আটকে গিয়েছিল লাতু, সেটার চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না।

মুসার কানে বাজতে থাকল: রান্দুনি গরে চাঁ-ফাতা আছে। বানাই খাইয়েন। বিস্কুটঅ আছে। চাঁ দি বিজাই খাইয়েন।

আফসোস করে বলল মুসা, 'শিয়ালে নিয়ে গেছে। বেচারা! ওই লোকটার কিন্তু কোন দোষ ছিল না। কারুণ ওকে বাধ্য করেছিল আমাদের ওপর গুলি চালাতে।'

'আমনে ঠিক কইছেন, বাই,' ঝোপের ভেতর থেকে কথা শোনা গেল। আস্তে করে ডাল সরিয়ে বেরিয়ে এল লাতু মিয়া। 'বন্দুকআন আমার হাতে দরাই দি কয় গুল্লি কইরবি, নইলে মারি ফালামু...'

'আপনি মরেননি?'

'না, মরি ন। ভেঙচি ধরি ফড়ি আছিলাম। দৌড় দিতে যাই উল্লুস খাই ফড়ি গেলাম। গুল্লি লাগে ন আমার শরীলে। রাখে আল্লা মারে কে।' পাশে পড়ে থাকা টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় বসাল সে। 'ডাকাইতগুন আমি মরি গেছি মনে করি চলি গেলে তাড়াতাড়ি উঠি যাই জঙ্গলে ডুকি হলাই থাইকলাম। আমার কুনো দোষ নাই, বাই।'

একটা মুহূর্ত হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। হাসিটা শুরু করল প্রথমে মুসা। সংক্রামিত হলো সেটা সবার মাঝে।

চৌহানের দিকে তাকাল কিশোর। 'দল তো বিরাট। যাব কিভাবে সবাই?'

'জাহাজে করে।' দুই ডাকাতকে দেখাল চৌহান, 'এদের দায়িত্ব এখন আমাদেরই নিতে হবে। পুলিশের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত। আমি যাচ্ছি জাহাজে। তোমাদের কেউ কপ্টারটাকে ওড়াতে পারবে?'

'পারব,' মুসা বলল। 'এ জিনিস আগেও উড়িয়েছি।'

'ভাল। তাহলে তুমি ওটা নিয়ে এসো। বাকি সবাই জাহাজে করে যাচ্ছি আমরা। যদি মনে করো মুনিআপ্পাকেও নিয়ে যেতে পারো তোমার সঙ্গে। গহনার ব্যাগটাও নিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে।'

'আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না আপনাদের,' ফারিঙ্গা

বলল। 'কোনো রকম গণ্ডগোল করব না আমরা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। আমার বোটটাকে পুড়িয়ে দেয়া হলো কেন? কত টাকা গেল আমার কল্পনা করতে পারছেন?'

'পারছি,' কাটা কাটা স্বরে জবাব দিল চৌহান। 'মানিয়াফুরায় গিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করবেন।'

গহনার ব্যাগটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মুসা। পেছন পেছন চলল রজন। বাকি সবাই দল বেঁধে হাঁটতে শুরু করল জাহাজের দিকে।

কেবিনটা চোখে পড়লে রজনকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'দরজাটা খোলা। লাগিয়ে দিয়ে আসবেন নাকি?'

'না। জাহান্নামে যাক কেবিন। দ্বীপটা এখন আমার জন্যে একটা দুঃস্বপ্ন। যা ভোগা ভুগেছি, কোনদিন আর এখানে পা রাখতে চাই না আমি। চুলোয় যাক শুঁটকির ব্যবসা। শিয়ালগুলোর একটা ব্যবস্থা অবশ্য করা দরকার। কি করব, পরে ভাবব।'

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় মানিয়াফুরার ল্যান্ডিং স্ট্রিপে হেলিকপ্টার নামাল মুসা।

একটু পরে জাহাজ নিয়ে বাকি দলটাও পৌঁছে গেল। রেডিওতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করল চৌহান। ওরা না আসা পর্যন্ত আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হলো দুই ডাকাতকে। কথা বলে বোঝা গেল, লাতু মিয়া ডাকাতদের দলে পড়ে না। বড়ই নিরীহ মানুষ। তাকে ছেড়ে দেয়া হলো।

মুসা বোটটা পুড়িয়ে দেবার পর কি ঘটেছিল, জানা গেল সব। মাছধরা জাহাজের ক্যাপ্টেন ধোঁয়া দেখে রাতুন দ্বীপে যায়। কারণ আর দুই সঙ্গীকে তুলে নিয়ে মানিয়াফুরায় চলে আসে। ক্যাপ্টেনকে ওরা জানায়, দুর্ঘটনায় আগুন লেগে ওদের বোট পুড়ে গেছে। রাতের বেলা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে যায় এমন একটা লোকের কাছে, যে পুরানো অবৈধ অস্ত্র বিক্রি করে। তিনটে পিস্তল আর একটা রাইফেল কেনে। তারপর বন্দরে গিয়ে সেই জাহাজটাই চুরি করে যেটা দিয়ে ওদের উদ্ধার করে আনা হয়, এতই অকৃতজ্ঞ। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ, তীরের কাছে অন্ধকারে মাছ ধরছিল তখন একটা ছেলে। সে দেখে ফেলে দৌড়ে গিয়ে মালিককে খবর দেয়। চৌহানের কাছে ছুটে যায় মালিক। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে ছুটে যায় দ্বীপে।

যাই হোক, ভালয় ভালয়ই শেষ হলো সব। মানিয়াফুরা থেকে তিন গোয়েন্দার রওনা হবার দিন এসে হাজির হলো লাতু মিয়া। কেঁদে পড়ল, 'বাই, আমারে আমনেগ লগে লই যান। আমনেরা খুব

বালা মানুষ বুইঝদে ফাইচ্ছি। আমারে একটা চাকরি দেন। আমি খুব বালা বাবুচ্চি।'

এতই কাতর অনুরোধ, মন গলে গেল গোয়েন্দাদের।

হাসল কিশোর। 'ঠিক আছে, চলুন। বহুদিন থেকেই মামী একজন ভাল বাবুর্চির খোঁ

-: শেষ :-